কায়রোর রহস্য

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

galporchhabi.blogspot.com

কায়রোর রহস্য

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

নির্মল বুক এজেন্সী

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৭



॥ এক ॥

আকাশ পথের আগন্তুক

লণ্ডন থেকে প্লেন ছেড়েছে। যাবে কায়রো। প্লেনে যাত্রীর সংখ্যা প্রায় জন চল্লিশ। বিভিন্ন দেশের যাত্রী আছে। কেউ ইংরেজ, কেউ ফরাসি, কেউ জার্মান, কেউ ইতালিয়ান। ভারতীয় যাত্রী মাত্র একজন—সুজিত রায়।

allporchhabi.blogspot.com

সুজিতের বয়স বছর ছাব্বিশ। তার বাড়ি কলকাতায়। পাঁচ বছর আগে ইংলণ্ডে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এসেছিলো। পরীক্ষায় পাশ করে ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরছে।

পাঁচ বছর পরে দেশে ফিরছে সুজিত। মনে ওর খুব আনন্দ। মনে হয়, কতো যুগ আগে দেশ ছেড়েছে।

সেই কলকাতা শহর, সেই কলেজের বন্ধুরা, সেই আড্ডা, তার ওপর মা, বাবা, ছোটো বোনের সঙ্গ। তাদের জন্য মনটা উতলা হয়ে উঠেছে।

ফেরার পথে সুজিত কয়েকটি জায়গায় নেমে দিন কয়েক করে থেকেছে। প্যারিসে থেকেছে তিনদিন, তারপর জুরিখে দু'দিন, সেখান থেকে ফ্রাঙ্কফুর্টে পাঁচদিন কাটিয়ে একেবারে রোমে।

রোমে চারদিন থেকে সে এইমাত্র প্লেনে উঠেছে। এবার যাবে কায়রো। পিরামিডের দেশে চারদিন কাটিয়ে সে সোজা চলে যাবে কলকাতা।

প্লেন ছুটে চলেছে আকাশের বুক চিরে। মাঝখানে কোথাও না থেমে সোজা যাবে কায়রো। অনেকক্ষণ হলো সন্ধ্যা হয়েছে। বাইরে অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না।

—বিরক্ত করছি বলে মাপ করবেন, আচ্ছা, আপনি কি ভারতীয় ?

সুজিতের চিন্তায় বাধা পড়লো। প্রশ্ন করছেন তার পাশের যাত্রী। চেহারা ও পোশাকে মনে হয় য়ুরোপিয়ান। তবে মাথার চুল কালো। বছর চল্লিশ বয়স। চোখে কালো মোটা ফ্রেমের চশমা। নিখুঁতভাবে দাড়ি গোঁফ কামানো।

সুজিত বললো, হ্যাঁ। আপনি ?

ভদ্রলোক বললেন, আমি আমেরিকান। আমার নাম হেনরি রিচার্ডসন।

সুজিত সাহেবি কেতামতো করমর্দন করে বললো, হাউ ডু ইয়্যু ডু, মিঃ রিচার্ডসন।

ভদ্রলোক বললেন, হাউ ডু ইয়্যু ডু ? ইণ্ডিয়ানদের আমার খুব ভালো লাগে। গান্ধী, নেহরু আর টেগোরের দেশ।

সুজিত বললো, মিঃ রিচার্ডসন আপনি কোথা থেকে আসছেন, কোথায় যাবেন ?

রিচার্ডসন বললেন, আমি আসছি লণ্ডন থেকে। যাবো কায়রো। আমি ট্যুরিষ্ট। দেশ দেখতে বেরিয়েছি। তুমি তো রোম থেকে উঠলে, কোথায় যাবে ?

সুজিত বললো, আমি ছাত্র। দেশে ফিরছি। ফেরার পথে দেশভ্রমণ করছি। বলতে পারেন, শৌখিন ট্যুরিষ্ট ! আমিও যাবো কায়রো।

—কায়রোতে কোথায় উঠবে ?

—আমি উঠবো ৪১০ মোস্তাফা কামাল পাশা স্কোয়ারে। হোটেল মেট্রোপোলে। আগে থেকে চিঠি দিয়েছি বুকিং-এর জন্য। আপনি কোথায় উঠবেন ?

রিচার্ডসন উদাসকণ্ঠে বললেন, আমি যে কোথায় উঠবো, তা এখনো ঠিক করিনি। তবে আমেরিকান এক্সপ্রেসের ওখানে একবার যাবো। দেখি, শেষ পর্যন্ত কোথায় ওঠা যায়। ভালো

কথা মিঃ—এই যাঃ, তোমার নামটা কি যেন, কই বলোনি তো ?

—সুজিত রয় ।

রিচার্ডসন একটি সুন্দর লাইটার বার করে সিগারেট ধরালেন। তারপর সুজিতকে বললেন, তুমি ধূমপান করো ?

সুজিত বললো, না ধন্যবাদ। কিন্তু লাইটারটা ওর খুব ভালো লাগলো। বললো, সুন্দর তো !

রিচার্ডসন লাইটারটি সুজিতের হাতে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, সত্যিই সুন্দর। এটা আইভরির কাজ করা। প্যারিস থেকে আমার স্ত্রী এনে দিয়েছিলেন। এটা তাঁর স্মৃতি। অনেকেই এটির প্রশংসা করেন।

—আপনার স্ত্রী কোথায় থাকেন ?

—আজ চার বছর হলো, তিনি নেই। এইজন্যই তো এটি আমার কাছে এতো প্রিয়। রিচার্ডসন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

সুজিত লাইটারটা নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখলো। বেশ ভারি। তাই একটু অবাক হলো।

বললো, লাইটারটা কিন্তু আয়তনের তুলনায় ভারি।

রিচার্ডসন বললেন, তার কারণ ভেতরটাও সলিড। এই জন্যই এটা এতো দামী। আমার স্ত্রী ঠুনকো জিনিস মোটেই পছন্দ করতেন না।

একটু পরে এয়ার হোস্টেস এসে ওদের গরম কফি আর পাতলা কাগজে মোড়া পাম কেক দিয়ে গেলো।

কেকে কামড় দিতে দিতে রিচার্ডসন বললেন, আমার ইণ্ডিয়া দেখার খুব ইচ্ছে। তোমাদের সভ্যতা কতো প্রাচীন। আমি ইণ্ডিয়ানদের লেখা অনেক বই পড়েছি। বিশেষ করে টেগোরের।

সুজিত বেশ অভিভূত হলো। পাঁচ বছর সে বিলেতে কাটিয়েছে। কিন্তু ইণ্ডিয়া সম্পর্কে এমন শ্রদ্ধাবান খুব বেশি লোককে সে দেখেনি। অনেক বিদেশীর চোখে ভারত এক অনুন্নত দেশ ; কুসংস্কারে ভরা।

সুজিত বললো, একবার আসুন না আমাদের দেশে। আপনারা আমেরিকানরা তো ঘুরে বেড়ান। আপনাদের কাছে ইণ্ডিয়া দেখা এমন কিছু নয়।

রিচার্ডসন বললেন, যাবো। এর আগে কায়রো কখনও এসেছো ?

—না। এই প্রথম।

আমার চেনাজানা অনেক লোক আছে কায়রোয়। কায়রোতে আমি দিন দশেক থাকবো। তুমি অবশ্য অতোদিন থাকবে না। তবু দু'-তিন দিন আমাদের দেখা হতে পারে। এক সঙ্গে বেড়ানো যাবে।

সুজিত বললো, তাহলে তো ভালোই হয়। শুনেছি, কায়রোতে বড় চোর ডাকাতের উৎপাত। আমার এক বন্ধু, কলকাতার একজন সাংবাদিক, ক'বছর আগে কায়রো এসেছিলেন। সোলেমান পাশা স্কোয়ারে পুলিশের সামনে দিনে-দুপুরে একটা বেদুইন ওঁর পকেট থেকে একটা দামী কলম ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেলো।

—তারপর ?

—তারপর আর কি! বন্ধুটি পুলিশে খবর দিলেন। এক থানা থেকে আর এক থানা। ওঁর হয়রানিই সার হলো। ওদের পুলিশের এমন কেরামতি যে আসামী আর ধরা পড়লো না।

রিচার্ডসন বললেন, সত্যি বিদেশে একটু সাবধানে পথ চলা উচিত।

ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করতে লাগলো সুজিত। কোথা থেকে সময় কেটে গেলো। একটু পরেই বড়ো বড়ো করে লেখা ফুটে উঠলো—আপনার বেল্ট বেঁধে নিন।

রিচার্ডসন বললেন, বোধহয় কায়রো এসে গেলো।

সত্যিই কায়রো এসে গিয়েছিলো। এয়ার হোষ্টেস ঘোষণা করলো—ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, আমরা এবার কয়েক মিনিটের মধ্যে কায়রো নামবো।

প্লেন নিচে নামতে লাগলো। তারপর এক ঝাঁকানি দিয়ে চাকা মাটি স্পর্শ করলো।

হাত ব্যাগটা নিয়ে ওভারকোটটা পরে সুজিত এয়ারপোর্টে নামলো! পিছন ফিরে রিচার্ডসনকে সে দেখতে পেলো না। ভাবলো, ভদ্রলোক বোধহয় এখনো নামেন নি। পরে দেখা হবে।

কাষ্টম্‌স অফিসাররা দাঁড়িয়ে আছেন। একটা ট্রলিতে করে

যাত্রীদের মাল এলো। সেগুলো পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা হলো। কাষ্টম্‌স অফিসাররা জিগ্যেস করতে লাগলেন—এটা কার মাল? এটা কার?

বাটারফ্লাই গোঁফ, তাগড়াই চেহারার এক আরব ওকে জিগ্যেস করলো, এনিথিং টু ডিক্লেয়ার অর্থাৎ তোমার কাছে শুল্ক দিতে হয়, এমন মাল কিছু আছে?

—না।

—সুটকেশ খোলো।

সুজিত সুটকেশ খুললো। না। কিছু নেই।

আর একজন ওর ওভারকোটের বোতামগুলো হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো। তারপর ঘাড় নেড়ে আরবি ভাষায় পাশের লোকটিকে কি বলতেই সে একটা খড়ি দিয়ে সুজিতের সুটকেশে দাগ দিয়ে বললো, যাও।

ভিসাতে ছাপ মেরে সুজিত এসে বাস ধরার জন্য দাঁড়ালো। পোর্টার এসে মাল তুলে দিলো বাসে। বাস যাবে আল ক্যাসতান ষ্ট্রীটে—সিটি টার্মিনাসে।

বাসে উঠে সুজিত ভালো করে খুঁজলো। কিন্তু রিচার্ডসনের দেখা পেলো না।

অনেকক্ষণ হলো সন্ধ্যা হয়েছে। কায়রো শহর আলোয় আলো, বাস এসে শহরের মধ্যে ঢুকেছে।

এই সেই ঐতিহাসিক নগরী কায়রো। এই শহরের এক প্রান্তে আছে ইতিহাস বিখ্যাত পিরামিড আর স্ফিঙ্কস। আছে আবাদিন রাজপ্রাসাদ, আল মুয়েজ্জাদ মসজিদ, জুয়ালিয়া প্রাসাদ দ্বার আর নীল নদ।

এই শহরের কথা সে ছোটোবেলায় ভূগোলে পড়েছে। কায়রো এক সুপ্রাচীন শহর। নীল নদের দান মিশরের রাজধানী।

সিটি টার্মিনাসে নেমে সুজিত ট্রাভেলার্স চেক ভাঙিয়ে আরব দেশের মুদ্রা নিলো। তারপর একটি ট্যাক্সি নিয়ে গেলো মোস্তাফা কামাল পাশা স্কোয়ারের হোটেল মেট্রোপোলে।

মেট্রোপোল একটি মাঝারি ধরনের হোটেল। তিনতলা বাড়ি। নিচে লাউঞ্জ আর রিসেপশন। রিসেপশনে বসে একটি মেয়ে টেলি-ফোনে কারোর সঙ্গে আরবি ভাষায় কথা বলছিলো।

সুজিতকে দেখে মেয়েটি পরিষ্কার ইংরাজিতে বললো, তোমায় সাহায্য করতে পারি ?

সুজিত বললো, এই হোটেলে আমার একটা বুকিং ছিলো। আমার নাম মিঃ এস রয়। লণ্ডনের লংরিজ রোড থেকে আসছি।

মেয়েটি খাতা দেখে বললো, ইয়েস। ইয়েস। তোমার নামে ৩২নং ঘর বুক করে রাখা হয়েছে। তুমি তোমার পাশপোর্টটা এখানে রেখে যাও। আর দয়া করে এই ফর্মটায় সই করো।

সুজিত চাবি নিয়ে ওপরে উঠে গেলো। ঘরটা তিনতলায়। জানলা খুলে দিলে রাস্তা চোখে পড়ে। বেশ সুন্দর বিছানা পাতা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। সুজিতের মনটা খুব খুশিতে ভরে উঠলো।

এবার গরম জলে স্নান করে নিতে হবে। সারাদিন যা ধকল গেছে শরীরে।

স্নান করবে বলে ওভারকোটটা খুলে আলনায় রাখতে গিয়ে ঠং করে একটা শব্দ হলো।

কী ব্যাপার ?

কোটের পকেটে হাত দিয়ে দেখলো ভারি মতো কি ঠেকছে। আরে, এ যে রিচার্ডসনের সেই লাইটার! এটা কী করে তার পকেটে এলো ?

যতোদূর মনে পড়ছে, সে দেখার জন্য লাইটারটি হাতে নিয়েছিলো বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তো ফেরৎ দিয়েছিলো।

তবে এটা পকেটে এলো কী করে ? তবে কি ভুল করে সে ওটা নিজের পকেটে রেখে দিয়েছিলো ? ছি-ছি ভদ্রলোক কি মনে ভাবছেন এতোক্ষণ। এটি তাঁর প্রিয় জিনিস। এখন কী করে এটা ফেরৎ দেওয়া যায়, সুজিত সেই নিয়ে বড়ো চিন্তায় পড়ে গেলো।



॥ দুই ॥

রহস্যময় লাইটার

বাথরুম থেকে স্নান করে বেরিয়ে সুজিত খুব স্বস্তি বোধ করলো। আঃ। পথের ক্লান্তি এক নিমেষে দূর হয়ে গেলো। স্নানের ব্যবস্থাও বেশ আরামের। গরম জলের বাথ-টবে গা ডুবিয়ে বসে থাকার মতো আরাম আর নেই।

এখন এক কাপ চা পেলে মন্দ হতো না। তারপর চা খেয়ে শহরটা একটু পায়ে হেঁটে দেখে আসা যেতে পারে। যদি কোনো

calborchhabi.blogspot.com

ভালো ছবি হচ্ছে দেখে, তো সিনেমায় ঢুকে পড়তে পারে।

অথবা আজ রাতটা পুরো বিশ্রাম নিলে মন্দ হয় না। কাল পরশু ট্যুরিষ্ট বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করে বেড়ানোর প্রোগ্রাম ঠিক করা যাবে।

সুজিত যখন এই সব কথা ভাবছে এমন সময় ফোনটা বেজে উঠলো।

—হ্যালো মিঃ রয়, আমি রিসেপশন থেকে বলছি।

—বলুন।

—এক ভদ্রলোক আপনাকে খুঁজতে এসেছেন।

—ভদ্রলোক ?

—হ্যাঁ। আপনি লাউঞ্জে আসুন।

সুজিত ভাবলো, তাকে আবার এ বিদেশ বিভুঁয়ে কে খুঁজতে আসবে ? নিশ্চয়ই সেই রিচার্ডসন। লাইটারটি না পেয়ে খুঁজতে এসেছেন। লাইটারটা ফিরিয়ে দিয়ে সুজিত নিশ্চিন্ত হবে।

নিচে নেমে দেখলো, হ্যাঁ যা ভেবেছে, তাই। মিঃ রিচার্ডসন।

সুজিত বললো, আরে দেখুন দেখি, কী মুশকিল। আপনার সেই সিগারেট লাইটারটা আমার কাছে। কি করে যে ওটা আমার পকেটের ভেতর এলো, সেটাই ভাবছি।

রিচার্ডসন বললেন, যাক, বাঁচালে। লাইটারটা না পেয়ে মনটা যা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। এয়ারপোর্টে ফোন করলাম। ওরা বললো, এয়ারক্র্যাফটের ভেতর ওরা কিছুই পায়নি।

—আপনি কোথায় উঠেছেন ?

দেখো তো, কী মুশকিল। হোটেলে কোথাও ঘর খালি পাচ্ছি না। চার-পাঁচটা হোটেল ঘুরলাম। তোমার এখানে ঘর খালি আছে ?

—দেখি, খোঁজ করা যাক।

রিসেপশনে গিয়ে খোঁজ করে জানা গেলো, দোতলায় চোদ্দ নং ঘরটা খালি আছে। রিচার্ডসন যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘরটা বুক করে ফেললেন।

সুজিত জিগ্যেস করলো, আপনার জিনিসপত্র ?

রিচার্ডসন বললেন, আমার সঙ্গেই আছে।

সুজিত বললো, তাহলে আর কি, চলুন, ঘরে চলুন। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন, দেখছি।

—যা বলেছো। এয়ারপোর্টে তোমায় কতো খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না।

সে কি ! আমিও তো আপনাকে খুঁজেছি।

আমি অবশ্য প্রথম বাসটা মিস করি। পরের বাসে এসেছি।

—সেজন্যই দেখা হয়নি। কোথায় আপনার লাইটারটার কথা মনে পড়লো ?

আরে, বাসে উঠে। সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখি, লাইটার নেই। এদিকে একবার মনে হচ্ছে, হয়তো তোমার কাছে ভুল করে দিয়েছি। আর একবার মনে হচ্ছে, এয়ারপোর্টে ফেলে এসেছি। খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম। তার ওপর হোটেলে সিট পেলাম না। একবার ২৬ জুলাই স্ট্রীট। আবার সেখান থেকে শাহ্ রামেসিস,

হোটেলের জন্য ছুটোছুটি করছি। তারপর মনে হলো, তুমি তো বলেছিলে, মেট্রোপোল হোটেলে উঠবে। ভাগ্যিস, বুদ্ধি করে এলাম।

কথা বলতে বলতে রিচার্ডসন আর সুজিত তিনতলায় উঠলো। চোদ্দ নম্বর ঘরে গিয়ে রিচার্ডসন বললেন, আমি আজ আর বেরোচ্ছি না, বুঝলে। একটু বিশ্রাম নেবো। তুমি কোথাও যাবে নাকি?

সুজিত বললো, একটু বেড়িয়ে আসি।

—যাও। কাল সকালে দেখা হবে। গুড নাইট।

—গুড নাইট।



॥ তিন ॥

রহস্যজনক ছায়ামূর্তি

কায়রো শহরটা সুজিত একটু ঘুরে দেখে নিলো। কলকাতার মতোই ঘিঞ্জি শহর। একদিকে আধুনিক সাহেবি পোশাকপরা মানুষ। মেয়েদেরও পরণে স্কার্ট। বব্ড করে ছাঁটা চুল। টকটকে ফরসা রং।

অন্যদিকে আলখাল্লা পরা বেদুইন দল। মাথা ঢাকা। ঘোমটার ভেতর থেকে হিংস্র চোখগুলো যেন জ্বলছে। দেখলে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

galpochhabi.blogspot.com

কামাল পাশা স্কোয়ার থেকে হাঁটতে হাঁটতে সুজিত আবদুল খলিল সরওয়াত স্ট্রীটে এসে পড়লো। ওই রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লো অপেরা হাউসের সামনে। এক পাশে আজবাকিয়া উদ্যান। অন্যদিকে পোষ্ট অফিস। সুজিত অপেরা হাউসে এসে দেখলো, একটা ভালো ইংরিজি ব্যালে হচ্ছে। দলটি সম্প্রতি ইংলণ্ড থেকে ওদেশে এসেছে। খোঁজ নিয়ে জানলো, টিকিট আছে।

সুজিত টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলো। একটু পরেই ব্যালে আরম্ভ হলো। বাজনার তালে তালে সুন্দর সুন্দর ছেলেমেয়ে ষ্টেজে এসে নাচতে লাগলো।

ঘণ্টা দুয়েক পরে শো যখন ভাঙলো তখন সুজিত বাইরে এসে দেখে, বেশ রাত হয়ে গেছে। রাস্তা নিঝুম হয়ে এসেছে। বাসের যাত্রীর সংখ্যাও কম। ঘড়ি দেখলো, রাত এগারোটা বাজে। তাড়াতাড়ি হোটেলের দিকে পা চালালো সুজিত। কিছুদূর এগিয়েছে,

অমনি দেখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, মধ্য বয়সী একটা লোক তার পিছনে পিছনে আসছে।

সুজিত কিছু খাওয়ার জন্য একটা রেষ্টুরেন্টে ঢুকলো। রেষ্টুরেন্টে দারুণ ভিড়। এক পাশে মাইক্রোফোনের সামনে একটি লোক হাত পা নেড়ে আরবি গান গাইছে। দুটো লোক সেই সঙ্গে গীটার বাজাচ্ছে। সুজিত রাতের খাওয়া শেষ করে বাইরে বেরোতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ওর চোখে মুখে ঝাপ্টা মারলো। একটু এগিয়েছে অমনি পেছনে ভারি বুটের আওয়াজ শুনে সুজিত তাকিয়ে দেখে—ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা সেই লোকটা।

কী আশ্চর্য, লোকটি এতোক্ষণ কি করছিলো! সে কি সুজিতকে অনুসরণ করছে? কোনো বদমাস লোকটোক নয় তো? সুজিত থমকে দাঁড়িয়ে গেলো। লোকটিও থমকে দাঁড়ালো। তারপর গটগট করে হেঁটে সুজিতের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। যাওয়ার সময় কটমট্ করে জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে সে সুজিতের দিকে তাকালো।

ভয়ে আঁতকে উঠলো সুজিত।

মনে হলো, এক বিষাক্ত সরীসৃপ তার দিকে দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিলো।

মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত।

কিন্তু তবু কি দুঃসহ।

লোকটি পাশের গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

সুজিত যখন হোটেলে ঢুকলো, তখন হোটেলের লাউঞ্জের আলো নিভে গেছে। গেটের দারোয়ান ওকে দরজা খুলে দিলো। লিফট-ম্যান ছিলো না। ওকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হলো।

তিনতলায় উঠে সুজিত দেখে, রিচার্ডসনের ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আর বাইরে দরজার সামনে একজন বেয়ারার পোশাক পরা লোক আড়ি পেতে কি শুনছে।

সুজিতকে দেখে লোকটা চমকে উঠে তাড়াতাড়ি কোথায় মিলিয়ে গেলো।

সুজিত তাড়াতাড়ি লোকটিকে অনুসরণ করলো। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে সে কোনদিকে যে গেলো, তা বোঝা গেলো না।

সুজিত তাড়াতাড়ি রিচার্ডসনের ঘরের কাছে এলো। দরজা বন্ধ। সামনে এসে দাঁড়াতেই কানে এলো কথাবার্তার আওয়াজ। আরবি ভাষায় দু'জনে কথাবার্তা বলছে। একটি গলা রিচার্ডসনের।

সুজিত দরজা নক করতেই ভেতরের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেলো। দরজা খুলে দিলেন রিচার্ডসন।

—আরে রয়, এসো, এসো।

সুজিত ভেতরে ঢুকে দেখলো, একজন আরব ভদ্রলোক বসে রয়েছেন। সাহেবি পোশাক পরা। মুখে পাইপ। বয়স চল্লিশের মতো।

রিচার্ডসন বললেন, তোমার সঙ্গে এঁর পরিচয় করিয়ে দিই। এঁর নাম আব্দুল খলিল। আমার যে বন্ধুর কথা বলেছিলাম কায়রোয় এঁর কিউরিয়োর দোকান আছে। ফোন করতেই ইনি এসেছেন। আর মিঃ খলিল, এ হচ্ছে আমার ইণ্ডিয়ান বন্ধু সুজিত রয়। কায়রো বেড়াতে এসেছে।

ভদ্রলোক এগিয়ে এসে করমর্দন করলেন।

সুজিত চুপি চুপি রিচার্ডসনকে বললো, আপনার সঙ্গে আমার একটু জরুরি প্রাইভেট কথা আছে, মিঃ রিচার্ডসন। একটু বাইরে আসবেন?

রিচার্ডসন বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। চলো।

বাইরে এসে সুজিত বললো, দেখুন, আপনারা যখন ভেতরে কথা বলছিলেন, তখন দেখি, বাইরে একজন বেয়ারা আড়ি পেতে আপনাদের কথাবার্তা সব শুনছে। এই হোটেলে চোর-টোর নেই তো! আমি প্রথম কায়রো এসেছি। সব দেখে শুনে বড়ো ভয় করছে।

রিচার্ডসন বললেন; তাই নাকি? তাহলে তো দেখছি, বড়ো ভাবনার কথা। তুমি লোকটাকে ধরতে পারলে না?

—আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই কোথায় যেন মিলিয়ে গেলো। আমি ভাবছি, ম্যানেজারকে এই কথা বলি।

রিচার্ডসন কি ভেবে বললেন, না রয়। এখন নয়। তাহলে ওরা হয়তো ভাববে, আমরা খুব ভীতু। একটু সাবধানে থেকো, তাহলেই হবে। আচ্ছা আজ শুতে যাওয়া যাক। মিঃ খলিলও বিদায় নেবেন। কাল আবার দেখা হবে, গুড নাইট।



॥ চার ॥

মমির আবির্ভাব

ভোরবেলা দরজার ধাক্কাধাক্কিতে ঘুম ভেঙে গেলো সুজিতের। দরজা খুলেই দেখে রিচার্ডসন।

সুজিত বললো, গুড মর্নিং।

—মর্নিং। এদিকে আমি একটু বিপদে পড়েছি, মিঃ রয়।

—কেন, আর কিছু ঘটেছে নাকি?

—ঘটেছে মানে? এই দেখো। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে এই চিঠিখানা দেখি ঘরের মাঝে পড়ে আছে। কি ডেঞ্জারাস! একবার ভাবো তো?

—চিঠি? কী ব্যাপার, দেখি?

রিচার্ডসন একখানা খাম সুজিতের হাতে তুলে দিলেন। তাতে ইংরিজিতে লেখা—রিচার্ডসন, পত্রপাঠ দেশে ফিরে যাও। নয়তো দারুণ বিপদ। জীবন্ত অবস্থায় আর ফেরার সুযোগ না হতেও পারে। ইতি—মমি।

সুজিত বললো, কী ব্যাপার? কিছুই বুঝতে পারছি না।

—দাঁড়াও। তোমাকে সব কথাই বলবো। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আর কাউকে বলতে পারবে না।

—প্রতিজ্ঞা করছি।

—রয়, তোমাকে বিশ্বাস করি বলেই বলছি। এই কথা বলে রিচার্ডসন চারিদিক দেখে নিলেন। তারপর চাপা গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, শোনো, ইন্টারপোলের নাম শুনেছো?

—আন্তর্জাতিক পুলিশ সংগঠন ?

—হ্যাঁ, আমি হলাম ইণ্টারপোলের একজন অফিসার। প্যারিসে আমাদের হেডকোয়ার্টার। আমাদের কাজ হলো, আন্তর্জাতিক অপরাধের কিনারা করা। ধরো, ফ্রান্সে একটা খুন হলো, কিন্তু অপরাধী পালিয়ে এসেছে ভারতে। তখন আমাদের ইণ্টারপোলের ওপর এই খুনীকে ধরার ভার পড়বে।

ইদানীং খবরের কাগজে বোধহয় দেখেছো, একদল আন্তর্জাতিক চোরাই-চালান-কারবারি মিডল্-ইষ্টের বিভিন্ন দেশে হীরের চোরাই চালান করছে। ওদের লিডারের নাম হলো, মমি। কায়রোতেই তার হেডকোয়ার্টার। ইণ্টারপোল আমায় এই দলকে ধরার ভার দিয়েছে। মমি এখন কায়রোতে—এই গোপন খবর পেয়ে আমি এখানে এসেছি। ওই যে খলিল বলে যে আরব ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করলে, আসলে উনি হলেন আমাদের ইণ্টারপোলেরই এজেণ্ট।

—এখানকার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন না কেন ?

—পাগল ! মমির কাছ থেকে এখানকার পুলিশ মোটা টাকার ঘুষ খায়। ওদের মুখ তাই বন্ধ। খুব গোপনে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। কিন্তু কি করে মমি আমাদের কথা জানতে পেরেছে। কাল রাতে আমাদের ঘরে কে আড়ি পাতছিলো, এ কথা যখন শুনলাম তখন বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আজ সকালে চিঠিটা পেয়ে খুব ঘাবড়ে গেছি। মমির অনুচরেরা দেখছি এই হোটেলেই আছে।

—কী ভয়ানক !

—হ্যাঁ, ভয়ানকই বটে। মমির অসাধ্য কিছুই নেই। এর আগে পাঁচজন ইণ্টারপোল অফিসারকে মমি খুন করেছে। এবার আমার পালা। কিন্তু মরতে আমি ভয় পাই না। তোমার সঙ্গে আমার দু'দিনের আলাপ, কিন্তু মনে হচ্ছে, কতো দিনের চেনা। তোমাকে দেখলে আমার ছোটো ভাইকে মনে পড়ে যায়।

সুজিত মিঃ রিচার্ডসনের কথা অবাক হয়ে শুনছিলো। মাত্র দু'দিনের পরিচয়ে এই বিদেশীকে আজ তার কতো আপনার বলে মনে

হচ্ছে। সত্যিই তো, কর্তব্যের আহ্বানে জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করতে চলেছে লোকটি।

রিচার্ডসন হঠাৎ বললেন, রয়, তুমি আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ রাখবে ?

—বলুন।

—তোমার কাছে আমার দু'টি প্রিয় জিনিস রেখে যাচ্ছি। একটি লাইটার আর একটি চাবির রিং। লাইটারটার কথা আগেই তোমাকে বলেছি। আর চাবির রিংটা আমার বাড়ির নিজস্ব ড্রয়ারের চাবি। এ-দুটো তোমার কাছে রেখে দাও। তুমি তো আরো তিন-দিন এখানে আছো। এর মধ্যে আমার যদি কিছু হয় তাহলে খলিলকে ফোন করে ডেকে এগুলি দিও। ও আমার বাড়িতে এগুলি পাঠিয়ে দেবে। কি বলো, এ উপকারটা করবে ?

রিচার্ডসন সুজিতের হাত দুটো জড়িয়ে ধরলেন।

সুজিত অপ্রস্তুত হয়ে বললো, আহা করছেন কি, করছেন কি মিঃ রিচার্ডসন।

রিচার্ডসন বললেন, তাহলে তুমি কিন্তু আমায় কথা দিলে, রয়। এই নাও খলিলের টেলিফোন নম্বর।

এই বলে রিচার্ডসন তাঁর লাইটার ও একটা চাবির রিং বার করে সুজিতের হাতে দিলেন। সেই সঙ্গে চিরকুটে লেখা খলিলের ফোন নম্বর আর ঠিকানা।

রিচার্ডসন বললেন, এই অমূল্য লাইটারটি প্লেনে তুমি উদ্ধার করেছো। এটাকে নিরাপদে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও তোমার। আর এই চাবির রিংটাও আমার কাছে অনেক দামী।

সুজিত বললো, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, মিঃ রিচার্ডসন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

রিচার্ডসন বললেন, কিন্তু আমাদের কথা যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারে। এমন কি কোনোদিন এখানকার পুলিশকেও আমার কথা বলবে না। ইণ্টারপোলের কাজের তাহলে অসুবিধা হবে।

সুজিত বললো, আমি আপনাকে কথা দিলাম মিঃ রিচার্ডসন, আমি

কাউকে একথা জানাবো না। কিন্তু কি ভয়ানক ব্যাপার, বলুন তো! রহস্য উপন্যাসে শুধু এ ধরনের গল্প পড়া যায়।

রিচার্ডসন বললেন, সত্যি ঘটনা গল্পের চেয়ে অনেক সময় রোমহর্ষক হয়। ইণ্টারপোলে আমি আজ পঁচিশ বছর ধরে কাজ করছি। কতো আন্তর্জাতিক বড়ো বড়ো অপরাধীদের পিছনে ঘুরেছি। কিন্তু মমির মতো অমন দুর্ধর্ষ অপরাধী একটাও চোখে পড়েনি।

অনেকদিন আগে জার্মানিতে একজন ভয়ঙ্কর ক্রিমিনালকে দেখেছিলাম। লোকটার নাম হের রুডল্‌ফ। অষ্ট্রিয়া থেকে জার্মানির মধ্যে লোকটি সোনা পাচার করতো। হের রুডল্‌ফ পঁচিশ জন পুলিশ অফিসারকে খুন করে ডানিয়ুবের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলো।

কিন্তু সেই রুডল্‌ফকে আমি গ্রেফতার করেছি। সাঁজবার্গের এক বস্তির মধ্যে সে লুকিয়েছিলো। কিন্তু আমার হাত থেকে সে পালাতে পারেনি। কিন্তু এই মমি রুডল্‌ফের চেয়েও দুর্ধর্ষ।

পৃথিবীর দশটি ভাষা সে মাতৃ ভাষার মতো বলতে পারে। সে নিজে একজন নামকরা বৈমানিক। সাবমেরিণ চালাতেও তার জুড়ি নেই। দু'হাতে সে রিভলবার চালাতে পারে।

সুজিত প্রশ্ন করলো, আপনি তাকে দেখেছেন?

—না, তবে তার ছবি দেখেছি। কিন্তু ছদ্মবেশ ধরতে সে ওস্তাদ। তুমি যদি তাকে কায়রোর রাস্তায় কোনোদিন দেখো, তাহলে মনে হবে, সে একজন আরব আবার চিকাগোর পথে দেখলে মনে হবে, সে একজন নিরীহ আমেরিকান।

—কিন্তু আপনি নিশ্চিত জানেন, মমি এখন কায়রোতে?

—নিশ্চিত জানি। খলিলের খবর ভুল হতে পারে না।

—আজ একমাস ধরে মমি এখন এখানেই আছে। তাকে শেষ দেখা গেছে চার দিন আগে আজাহির স্কোয়ারে। আমাদের খবর, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে একটা দামী হীরে আসছে। কায়রো থেকে সে হীরে চালান হয়ে যাবে সুইজারল্যাণ্ডে। ওখানে একজন ধনী

মার্কিন ভদ্রলোকের কাছে সে হীরে ত্রিশলক্ষ টাকায় বিক্রি করা হবে।

—ত্রিশ লক্ষ টাকা ?

—হ্যাঁ, আনকাট। এক তোলার মতো ওজন। হীরেটা ট্রান্স-ভালে এক ভারতীয় ব্যবসায়ীর কাছে ছিলো। ঐ ভদ্রলোকের পূর্বপুরুষ মোগল দরবারে কাজ করতেন। সে সময় তিনি হীরেটা পান। হীরেটা ওঁরা কোনো পুরুষে হাত ছাড়া করেন নি। কারণ জনশ্রুতি—ওটাই নাকি আসল কোহিনূর। ওই হীরে পুরুষানুক্রমে ওই ভদ্রলোকের পরিবারের ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলো। তাই ওটা তাঁরা প্রাণ ধরে বিক্রি করেন নি।

মাস ছয়েক আগে ভদ্রলোকের বাড়ি থেকে হীরেটা চুরি যায়। আমাদের খবর—এটা মমির কাজ। কারণ হীরে চুরির ব্যাপারে ওর মতো পাকা লোক আর নেই। সেবার বাকিংহাম প্যালেস থেকে কুইনমাদারের যে হীরেটা চুরি হয়ে গেলো, পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেলো, ওটা ছিলো মমির কাজ।

—আচ্ছা মমিকে কেউ দেখেছে, এমন অফিসার আপনাদের মধ্যে কেউ নেই ?

—কেন থাকবে না ? তবে তারা আজ আর কেউ জীবিত নেই। এমন কি কায়রো পুলিশের যে অফিসার কিছুদিন আগে আজাহার স্কোয়ারে মমিকে দেখেছিলো দু'দিন পরে তার প্রাণহীন দেহ নীলনদের জলে ভাসতে দেখা যায়। আর ইন্টারপোলের পাঁচজন অফিসারের কি পরিণতি হয়েছে তা তোমাকে আগেই বলেছি।

—তারা কি মমির সঙ্গে কোনো সঙ্ঘর্ষে মারা গেছে ?

—দু'জন মারা গেছে সঙ্ঘর্ষে। মমি গুলি করে তাদের মেরে ফেলেছে। তিনজন অবশ্য খুন হয়েছে হোটেলে। নৃশংসভাবে তাদের জবাই করা হয়েছে। আর তিনজনেরই চিঠির তলায় লাল কালি দিয়ে বড়ো বড়ো করে ইংরাজিতে লেখা—মমি।

—কী ভয়নাক !

—সত্যি ভয়ানক। রয়, আমরা পুলিশের লোক। অপরাধী যতোই দুর্ধর্ষ প্রকৃতির হোক না কেন, ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়া আমাদের সাজে না। মমির হাতে হয় আমার মৃত্যু না হয় আমার হাতে মমির।

বলতে বলতে মিঃ রিচার্ডসনের পেশীগুলো ফুলে উঠছিলো। ক্রোধে চোখে যেন আগুন জ্বলছিলো।

সুজিতের গা ছম ছম করতে লাগলো। কাল রাতে সে রাস্তা দিয়ে হাঁটবার সময় কালো গগল্‌স আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা এক-জনকে দেখেছে। লোকটি তাকে অনুসরণ করছিলো। আর যদিও তার চোখ দুটো কালো চশমার আড়ালে ঢাকা ছিলো তবুও তার নৃশংস মুখের ভাষা বুঝতে সুজিতের একটুও দেরি হয়নি।

সুজিতের ইচ্ছে হলো, একবার রিচার্ডসনকে সে কথা জানিয়ে দেয়। কিন্তু কি মনে ভেবে সেসব কথা কিছু বললো না।

রিচার্ডসন বললেন, যাও অনেক রাত হলো এবার ঘুমোতে যাও। তোমার কোনো ভয় নেই। পাশের ঘরে আমি আছি। কোনো কিছু হলে আমায় ডাকবে।

মিঃ রিচার্ডসন সুজিতের দিকে চেয়ে বললেন, শোনো ছোটো-বেলায় আমি খুব ভীতু ছিলাম। দশ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের পাশে ঘুমোতাম। আকাশে মেঘ ডাকলেই দারুণ ভয় করতো। বাবা আমাকে ঠাট্টা করে বলতেন আমার দ্বারা কোনো কাজই হবে না। কিন্তু সেই আমি মৃত্যুর মুখোমুখি যে কতোবার দাঁড়িয়েছি, তার ঠিক নেই। এখন ভয় বলে যে একটা শব্দ অভিধানে আছে তাও জানি না। ভয়কে যতো কম ভয় করবে ততোই তুমি মাথা উঁচু করে চলতে পারবে। আচ্ছা শুভ রাত্রি।

শুভ রাত্রি জানিয়ে সুজিত তার ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো, রাত প্রায় বারোটা। ভালো করে ঘরটা বিশেষ করে খাটের তলাটা একবার দেখলো। বলা যায় না, হয়তো কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে। সাবধানের মার নেই।

বিছানায় শুতে যাবার আগে সুজিত রিচার্ডসনের দেওয়া

লাইটার আর চাবির রিংটা বার করলো। লাইটারটি দেখে মনে হলো নিকেলের ওপর আইভরির রং করা। তবে বেশ ভারি। লাইটারটি জ্বালবার চেষ্টা করলো সুজিত। দু'-তিনবার চেষ্টা করতেই ফস করে আগুন জ্বলে উঠলো। আগুন নিভিয়ে ফেলে ওটাকে নিয়ে সে সুটকেশের ভেতরে পুরে ফেললো।

এই লাইটারটি মিঃ রিচার্ডসন তাকে কতো বিশ্বাস করে দিয়েছেন। যথাস্থানে পেঁৗছে না দেওয়া পর্যন্ত তার শান্তি নেই।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে সুজিতের দেশের কথা বার বার মনে পড়ছিলো। সুজিতের বাবা বালিগঞ্জ টেরাসে নতুন বাড়ি করেছেন। ওখানে আছে বাবা-মা আর তার একমাত্র ছোট্ট বোন। পাঁচ বছর আগে সে যখন দেশ ছেড়ে ছিলো তখন তার বোনের বয়স ছিলো মাত্র পাঁচ বছর। এয়ারপোর্টে এসে দাদার সঙ্গে প্লেনে ওঠার জন্ত তার সে কি কান্না।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সুজিত স্বপ্ন দেখলো সে তাদের বালিগঞ্জের বাড়িতে ফিরে এসেছে। মার সঙ্গে মমির গল্প করছে। আর তার ছোটো বোন কিছুতেই এ সব কথা বিশ্বাস করতে চাইছে না।

সে বার বার বলছে, ধ্যেৎ এ সব হয় নাকি? মিথ্যে গাল গল্প করার আর জায়গা পাও না।

সুজিত বলছে, মিথ্যে কথা নয় এই দেখো না, মিঃ রিচার্ডসনের সিগারেট কেস আর চাবির রিং।

বোন বলছে, কই দেখি।

কিন্তু কোথায় গেলো সেই লাইটারটি? পকেট হাতড়ে, সুটকেশ খুলে, সব কিছু সম্ভাব্য স্থান হাতড়ে কিছুতেই পাওয়া গেলো না। সুজিত তখন কি করবে ভেবে পেলো না। ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠলো।

এমন সময় ঘুম ভেঙে গেলো। শুনতে পেলো, কে যেন সজোরে দরজা ধাক্কাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিতেই দেখে, বেয়ারা চায়ের ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে। 'মর্ণিং টি' দিতে এসেছে।

—গুড মর্ণিং। বেয়ারা সুপ্রভাত জানালো।

—মর্ণিং। সুজিত বললো, ক'টা বেজেছে?

—সাতটা বেজে গেছে।

—তোমার নামটা যেন কি?

—আব্দুল।

—আচ্ছা আব্দুল, আমি আজ শহরটা ঘুরতে চাই। তোমাদের শহরে দু'দিন ঘুরে কি কি দেখা যায়, বলতে পারো?

আব্দুল বললো, হুজুর, আমাদের কায়রো শহর হলো দুনিয়ার মধ্যে সেরা শহর। কতো জিনিস যে এখানে দেখার আছে। যেমন ধরুন—পিরামিড, স্ফিংকস, মার্বেল পাথরের মসজিদ, আবাদিন প্যালেশ, মিউজিয়ম। জুয়ালিয়া দরজা। হাতে সময় থাকে ২৬শে জুলাই স্ট্রীট থেকে তাহির স্কোয়ার পর্যন্ত বিকেলবেলা হাঁটুন। নয়তো আসুন নীল নদের ধারে। আমি হুজুর ছুটি পেলেই বালবাচ্চা নিয়ে নীল নদের ধারে বেড়াতে যাই।

আব্দুল চলে গেলে মর্ণিং টি খেয়ে সুজিত স্নান সেরে নিলো। তারপর জামা কাপড় পরে বেরোবার সময় দেখলো, রিচার্ডসন সাহেবের ঘরে তালা ঝুলছে। সুজিত ব্রেকফাষ্টের টেবিলে আব্দুলকে জিগ্যেস করলো, আচ্ছা রিচার্ডসন সাহেবকে সকাল থেকে দেখছি না কেন?

সাহেব সকালেই কোথায় বেরিয়ে গেছেন। তারপর—

আব্দুল জিগ্যেস করলো, তাহলে আপনি কোথায় চললেন?

সুজিত বললো, আমি আজ একটু ঘুরবো। তাছাড়া আমেরিকান এক্সপ্রেসের অফিসে যাবো। ওখানে ট্রাভেলার্স চেক ভাঙাতে হবে।

আব্দুল বললো, সাহেবের সঙ্গে আপনার বুঝি অনেকদিন আগে থেকে আলাপ?

—না। এখানে এসেই আলাপ হয়েছে।

আব্দুল বললো, সাহেব কি করেন? বিজনেসম্যান নাকি?

এখানে যে সব বড়ো বড়ো সাহেব আসেন, সবাই বিজনেসম্যান।

সুজিত সতর্ক হলো। আব্দুল এতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করছে কেন? এখানকার আর্দালির উপর তার আর বিশ্বাস নেই। কাল একজনকে সে নিজের চোখে আড়ি পাততে দেখেছে।

সুজিত বললো, সাহেব কি করেন, আমি ঠিক জানি না। আমাকে যেন বলেছিলেন, উনি আমেরিকাতে কি একটা চাকরি করেন। এখানে এসেছেন বেড়াতে। ওঁর কিছু বন্ধুবান্ধব এখানে আছেন।

ব্রেকফাষ্ট শেষ করে সুজিতের হঠাৎ মনে হলো, লাইটারটা ওভাবে ফেলে যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ হোটেলের ডুপ্লিকেট চাবি এদের কাছে থাকতে পারে। কেউ ঘরে ঢুকতে পারে। এই মনে করে সে আবার ওপরে উঠে লাইটারটি এনে তার হাত ব্যাগের ভেতর রেখে দিলো। তারপর বেরিয়ে পড়লো।



॥ পাঁচ ॥

অযাচিত উপদেশ

ব্রেকফাষ্ট খেয়ে সুজিত শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লো। তার কাছে আছে আমেরিকান এক্সপ্রেসের ট্রাভেলার্স চেক। অন্তত কয়েক পাউণ্ড ক্যাশ করার দরকার।

রাস্তা দিয়ে জনস্রোত চলেছে। পোর্ট সৈয়দ স্ট্রীট থেকে হাঁটতে হাঁটতে আল আজাহার স্ট্রীটে এসে পড়লো সুজিত। আমেরিকান এক্সপ্রেসের অফিস এই রাস্তায়।

এদিকে সুজিতকে একা রাজপথ দিয়ে চলতে দেখে এক গাদা বেদুইন ছেঁকে ধরলো। কেউ বলছে। লটারির টিকিট কেনো। কেউ বলছে গাইড চাই? কেউ বলছে ভালো কিউরিও কিনবে?

সুজিতের মনে পড়লো তার এক সাংবাদিক বন্ধু ওকে বার বার সতর্ক করে দিয়েছিলেন কায়রোর রাস্তায় একটু সাবধানে চলতে।

সুজিতের ঐ সাংবাদিক বন্ধু একবার সোলেমান পাশা স্কোয়ার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন বেদুইন এসে তাঁর মুখের কাছে একটা কাগজ ধরে বললো, লটারির টিকিট কিনবে?

বন্ধু যেই ঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন অমনি দেখেন তার কোটের বুক পকেট থেকে দামি মণ্ট ব্ল্যাঙ্ক কলমটা নেই। সেই বেদুইনটি চোখের নিমেষে তাঁর পকেট থেকে কলমটি নিয়ে উধাও হয়ে গেলো।

সুজিত পকেট আর ব্যাগ সামলে পথ চলছিলো। সামনের

একজন বেদুইনকে দেখতে পেয়ে জিগ্যেস করলো, আমেরিকান এক্সপ্রেসের অফিসে যাবো কোনদিকে ?

বেদুইনটি সুজিতের দিকে কিছুক্ষণ শ্যেন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। তারপর বললো, আমার সঙ্গে এসো।

সুজিত লোকটির অনুসরণ করলো। মিনিট পাঁচেক চলার পর ওরা আমেরিকান এক্সপ্রেসের অফিসে ঢুকলো। তারপর বেদুইনটি এক সাহেবের কানে কানে কি যেন বললো।

সাহেবটি সুজিতকে ডেকে বললো, আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারি ?

সুজিত বললো, আমি পাঁচ পাউণ্ডের একটা ট্রাভেলার্স চেক ভাঙাতে চাই।

সাহেব বললো, বেশতো! কিছু মনে করবেন না। আপনি কি পাকিস্তানী ?

—না, ভারতীয়।

—কোথায় উঠেছেন ?

—মেট্রোপোল হোটেলে।

—আপনি কি ষ্টুডেণ্ট ?

—হ্যাঁ। কিন্তু আমার সম্পর্কে আপনার কৌতূহল বড়ো বেশি হয়ে যাচ্ছে না ?

—আমি খুব দুঃখিত। আপনি বিরক্ত হচ্ছেন বলে। দেখুন, আপনি ছেলেমানুষ, আপনাকে একটা কথা বলি। অপরিচিত লোকের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করবেন না।

—আপনি কি বলতে চান ?

—আমি বলতে চাই, আপনি বিদেশী। দু'দিনের জন্য এসেছেন। অপরিচিত কারুর কথায় চট করে ভুলবেন না।

—কে আপনি ?

—আমার পরিচয় ঠিক সময়ই পাবেন।

লোকটি আর কোনো কথা না বলে উঠে চলে গেলো। সুজিত একটু ঘাবড়ে গেলো। লোকটি তাকে এভাবে বললো কেন ?

রিচার্ডসনের সঙ্গে তার কথাবার্তা কি লোকটি জানতে পেরেছে? এই লোকটি মমির কোনো চর নাকি?

সুজিত রাস্তায় বার হয়েই দেখলো, সেই বেদুইনটা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে ইংরেজিতে বললো, সাহেব, বকশিস।

—কিসের বকশিস?

—আপনাকে এতোদূর পথ চিনিয়ে নিয়ে এলাম।

সুজিত একটু বিরক্ত হয়ে পকেটে হাত দিয়ে কুড়িটি পিয়াস্তা ওকে বার করে দিলো।

বেদুইনটি তার ছোপ ধরা দাঁত বার করে হেসে উঠলো। তারপর বললো, থ্যাঙ্ক ইয়্যু।

সুজিত ওখান থেকে মিউজিয়ম দেখতে গেলো। তারপর জেনে নিলো, পিরামিডে যাবার বাস ক'টার সময় ছাড়ে। সে জানতে পারলো, পনেরো মিনিট অন্তর পিরামিডে যাবার বাস পাওয়া যায়। ঠিক করলো, সে আগামীকাল সকাল বেলা পিরামিড দেখতে যাবে।

ফেরার সময় দেখলো, সেই বেদুইনটি তখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। সে পা চালাতে বেদুইনটাও হাঁটতে শুরু করলো। লোকটি অপেরা হাউসের কাছে এসে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো।



॥ ছয় ॥

নিশীথ রাতের আগন্তুক

বিকেলবেলা রিচার্ডসনকে সুজিত সকালের সব ঘটনার কথা বললো।

রিচার্ডসন বললেন, লোকটা নিশ্চয়ই মমির কোনো চর। আচ্ছা, কী রকম দেখতে বলো তো?

সুজিত বললো, আলখাল্লা পরা বেদুইন। একমুখ দাড়ি। আর কি বীভৎস দু'টি চোখ। সে চোখ দু'টি দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। গতকালও ঠিক এই রকম একটা লোক আমাকে অনুসরণ করেছিলো।

qalporchhabi.blogspot.com

রিচার্ডসন বললেন, একটু সাবধানে চলা-ফেরা করা দরকার। শোনো, তোমার পাশের ঘরটা খালি হয়েছে। আজ আমি ওই ঘরে চলে আসছি। আচ্ছা সে জিনিস দুটো কোথায় রেখেছো?

সুজিত বললো, আমার ব্যাগের ভেতরে।

রিচার্ডসন বললেন, মমি সম্পর্কে আমার সমস্ত তথ্য জোগাড় হয়ে গেছে। তোমাকে বলি, কাল রাতে আমি মমির গুপ্ত ডেরার সন্ধানে বার হবো। সুতরাং কাল রাতটা আমার জীবনের এক ভয়ঙ্কর রাত্রি। পরশু বিকেলে তোমার প্লেন। আমি যদি না ফিরি তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করো না। ক্যালকাটাতে আমার লোক তোমার কাছে গিয়ে ওটি নিয়ে নেবে।

সুজিত বললো, মমির কোনো সন্ধান করতে পারলেন?

রিচার্ডসন বললেন, আজ ভোরেই আমি বেরিয়ে গিয়েছিলাম। আমি আর আমার সহকারী মিঃ খলিল দুজনে কায়রো থেকে দশ মাইল দূরে একটা শহরে গিয়েছিলাম। অবশ্য দু'জনেই ছদ্মবেশে। ওখানে

একজন জহুরি থাকে। সে চোরাই বহু মালের কেনা-বেচা করে। মমি লোকটির কাছে আসে। মমির অনুচর সেজে আমিও ওর কাছে গিয়েছিলাম হীরে বিক্রি করতে। উদ্দেশ্য—কৌশলে মমি সম্পর্কে সঠিক খবর জেনে নেবো।

—কিছু জানতে পারলেন ?

আমার কাজ বারো আনা এগিয়ে আছে। মমি এখন কায়রোতেই আছে। আমরা যাওয়ার দু'দিন আগে সে ওখানে এসেছিলো। আমি ওকে বলেছিলাম, দেখো, আমরা মমির দলের লোক বটে কিন্তু ওকে না জানিয়ে একলা কারবার আরম্ভ করেছি। এখন থেকে মাল আমার কাছ থেকেও কিনতে পারো। কিন্তু খবর্দার এ খবর যেন ঘুণাক্ষরেও জানাজানি না হয়ে যায়।

—তা লোকটি কি বললো ?

—তাতেই রাজি হয়ে গেলো। এরপর সুযোগ বুঝে আমি জিগ্যেস করলাম, মমি এখন কায়রোতে নেই। খবর্দার ফিরে এসে যেন আমার কথা না জানতে পারে।

লোকটি তখন বললো, মমি কায়রোতে নেই ? কোথায় গিয়েছে ? এইতো গত পরশু দিনই তাকে দেখেছি।

আমি সুযোগ বুঝে ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা করলাম, বললাম, গতকাল সে গিয়েছে বেইরুট। একটা ভালো মাল আসছে। ও আবার কালই এখানে আসবে।

সুজিত প্রশ্ন করলো, আচ্ছা মিঃ রিচার্ডসন, মমিকে তো আপনি সামনা সামনি কোনো দিন দেখেন নি তাই না ?

রিচার্ডসন বললেন, না, তা অবশ্য দেখিনি। মমিকে সামনা সামনি দেখে, প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছেন এ পর্যন্ত মাত্র দু'জন পুলিশ অফিসার। তবে মমিকে ছদ্মবেশের বাইরে দেখতে পাওয়া খুব শক্ত। কারণ নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণে সে অদ্ভুত পটু। তার চেহারার মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। তামাটে রঙের পাকানো চেহারা। ওজন হবে মাত্র সাড়ে নয় ষ্টোনের মতো। একটু খাটো। মাথার চুল ছোটো ছোটো করে ছাঁটা। চোখ দু'টি নিরীহ শান্তিপ্রিয় নাগরিকের

মতো। আমি তার ছবি বহুবার দেখেছি। বার বার মমির ছবির দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে, এই নিরীহ মানুষটি কী করে এমন দুর্দান্ত হতে পারে। কিন্তু রয়, পুলিশ লাইনে দীর্ঘদিন থেকে অপরাধী ঘেঁটে ঘেঁটে মনে হয়েছে, শতকরা আশিজন অপরাধীর চেহারা নিরীহ লোকের মতো।

সুজিত বললো, আশ্চর্য, সত্যি কথা বলতে কি, আপনার সাহসের প্রশংসা করতে হয় মিঃ রিচার্ডসন।

মিঃ রিচার্ডসন বললেন, আমাদের এই কাজে মৃত্যু তো প্রতিদিনের সঙ্গী, তাই অন্তত মৃত্যু ভয় আমাদের মোটেই বিচলিত করতে পারে না। তাছাড়া অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দ তো আছেই।

দু'জনে মিলে যখন কথা বলছে তখন বন্ধ দরজার ওপাশে যেন খুট করে কি শব্দ হলো।

মিঃ রিচার্ডসন চেঁচিয়ে উঠলেন, কে, কে ?

অমনি দরজার ওপাশে পায়ের আওয়াজ শোনা গেলো। কে যেন দ্রুত নেমে যাচ্ছে।

মিঃ রিচার্ডসন তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। সুজিত তাকে অনুসরণ করলো। মিঃ রিচার্ডসন বললেন, মনে হলো, কে একটা লোক তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলো। চলো, নিচে গিয়ে দেখি।

ওরা নিচে নেমে গেলো। কিন্তু কোথায় কে ? একতলায় লাউঞ্জে রিসেপসনিষ্ট বসে ছিলো। তাকে জিগ্যেস করলেন রিচার্ডসন, কাউকে নামতে দেখেছেন ওপর থেকে ?

—কতোক্ষণ আগে বলুন তো ?

—এই তো এক মিনিটও হবে না।

—না। আমাদের ম্যানেজারের পর ওপর থেকে কেউ পনেরো মিনিটের মধ্যে নামেন নি।

—ম্যানেজারবাবু কোথায় ?

—বেরিয়ে গেছেন। আপনার যদি কিছু দরকার থাকে আমাকে বলতে পারেন।

—আচ্ছা সত্যিই কাউকে নামতে দেখেন নি ?

—একজনের নামা বইতো নয়। মিথ্যে কথা কেন বলবো, বলুন। কিন্তু আপনি এমন উত্তেজিত হয়ে নেমে এলেন যে, মনে হলো যেন ডাকাত পড়েছে। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো ?

—না, কিছু নয়।

আবার ওপরে ফিরে এলেন রিচার্ডসন। বললেন, তুমি একটু সাবধানে থেকো, রয়। মমি আমাদের ছায়ার মতো অনুসরণ করছে তোমার ডিনার হয়ে গিয়েছে ?

—না।

তাহলে চলো এক সঙ্গে ডিনার সেরে নেওয়া যাক। সুজিত ও রিচার্ডসন দু'জনে গ্রাউণ্ড ফ্লোরের রেষ্টুরেন্টে এসে বসলো।

রাত প্রায় দশটা। রেষ্টুরেন্ট জমজমাট। এক পাশে একটি ষ্টেজের ওপর কতোগুলি লোক বাজনা বাজাচ্ছে। বিলিতি জাজ সঙ্গীত।

রিচার্ডসন ও সুজিত এসে একটি খালি টেবিলে বসলো।

রিচার্ডসন বললেন, জানো রয়, সেবার গিয়েছিলাম বার্লিনে একটা কেসের ব্যাপারে তদন্ত করতে। ইংলণ্ডে কিছুদিন আগে যে বিখ্যাত মেল ডাকাতি হয়েছিলো তার কয়েকজন আসামী এখানে পালিয়ে আছে, শুনেছিলাম। সেদিনও রাতে আমার সহকারীকে নিয়ে বার্লিনের কুরফুরস্তাদামের এক রেষ্টুরেণ্টে বসে আছি। আমার ওটা ছিলো চারজনের টেবিল। দুটো সিট খালি ছিলো। আর কোথাও জায়গা না পেয়ে দু'জন ভদ্রলোক এসে বসলেন আমার টেবিলে। আমি ও আমার সহকারী এমন ব্যস্ততার ভাব দেখালাম যে আমি যেন ওঁদের লক্ষ্যই করছি না।

দেখি, ভদ্রলোক দু'জন চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন।

একজনকে বলতে শুনলাম, নীল মোটর আজ রাতে আসবে বলেছে। কিন্তু মালটা কি নেওয়া উচিত হবে ?

আর একজন বললো, কেন উচিত হবে না ?

ষ্টার্লিং-এর দাম আরো বাড়বে।

দ্বিতীয়জন বললো, তাহলে নীল মোটরকে আসতে বলি।

—কোথায় আসবে?

—কাইজার স্ট্রীটের বাড়িতেই আসুক।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ওখানে আসাই সুবিধে।

আমার কান ছিলো ওদের কথার মধ্যে। নীল মোটর শব্দটা শোনামাত্র আমি উদগ্রীব হয়েছিলাম। আমি জানতাম, ইংলণ্ডের সেই বিখ্যাত মেলডাকাতি কেসের কয়েকজন আসামী নীল মোটরে করে এসেছিলো। আমার যেন কেমন সন্দেহ হলো।

তাড়াতাড়ি রেষ্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে ফোন করে দিলাম পুলিশের সদর দফতরে। কাইজার স্ট্রীটে যেন এখন থেকে সাদা পোশাকের কড়া পুলিশ প্রহরা মোতায়েন রাখা হয়।

সুজিত তন্ময় হয়ে শুনছিলো। জিগ্যেস করলো, তারপর?

তারপর তিনদিনের মাথায় কাইজার স্ট্রীটের এক বাড়িতে চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের নোট সুদ্ধ তিনজন আসামী ধরা পড়লো। খবরের কাগজে নিশ্চয়ই সে খবর দেখে থাকবে।

—গুড ইভনিং স্যর।

ওরা দু'জন তাকিয়ে দেখলো, আব্দুল। নিখুঁতভাবে উর্দি পরা। হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

—হ্যালো আব্দুল।

কী খাবেন স্যর? কিসের স্যুপ দেবো, চিকেন না ভেজিটেবল? চিকেন কি খাবেন—রোষ্ট না ইণ্ডিয়ান কারি?

মিঃ রিচার্ডসন বললেন, ইণ্ডিয়ান কারিই দাও হে। রয় আছে এখানে। ওর অনারে খাওয়া যাক। কারি আর রাইস, কি বলো রয়?

সুজিত বললো, তা মন্দ হয় না।

একটু পরে আব্দুল খাবার নিয়ে এলো।

খাবার দিতে দিতে আব্দুল জিগ্যেস করলো, আর ক'দিন আছেন, স্যর?

সুজিত বললো, আমার ভিসার মেয়াদ আর মাত্র চারদিন। আজ তো বুধবার, শনিবারের প্লেন ধরবো।

আর সাহেব ?

রিচার্ডসন বললেন, বলতে পাচ্ছি না। কেন বলো তো ?

আব্দুল বললো, কিছু না। এমনি।

আব্দুল চলে গেলে রিচার্ডসন সুজিতকে বললেন, দেখো, আব্দুলটাকে আমার সুবিধা বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, ওর কোনো মতলব আছে। দেখছো কেমন গায়ে পড়া ভাব।

সুজিত বললো, আমারও মনে হয়। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ভেতরের খবর জানবার চেষ্টা করছে।

রিচার্ডসন বললেন, তুমি কিন্তু ওর সামনে বেশি মুখ খুলো না।

সুজিত বললো, আচ্ছা।

খাওয়া সেরে ওরা দু'জন ওপরে উঠে গেলো।

রিচার্ডসন বললেন, তাহলে শুভ রাত্রি। এবার গিয়ে শুয়ে পড়ো। কাল তোমার প্রোগ্রাম কি ?

—শহর দেখা। যদি সময় পাই, তাহলে পিরামিড দেখতে যাবো। আপনি কাল কি করবেন ?

তোমাকে তো আগেই বললাম, কাল আমার নিরুদ্দেশ যাত্রা। যদি ফিরি তাহলে দেখা হবে। আমার সেই জিনিসটা তুমি নিরাপদে রেখে দিও। যদি দরকার হয় তাহলে আমি কোনো পত্রবাহককে পাঠাবো। তার হাতে ওটা তুমি খলিলকে দিয়ে দেবে। যদি কেউ না আসে তাহলে কলকাতা থেকে আমার কোনো লোক ওটা নিয়ে নেবে।

সুজিত বললো, আচ্ছা।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে সুজিত টাইম ম্যাগাজিন পড়তে লাগলো। তারপর কি মনে করে তার হাত ব্যাগের ভেতর থেকে লাইটারটি বার করলো। লাইটারটি একটু নাড়াচাড়া করতেই ফস করে আলো জ্বলে উঠলো।

তাড়াতাড়ি আলো নিবিয়ে ফেললো সুজিত। লাইটারটি হাতে করলেই যেন গায়ের মধ্যে শির শির করে ওঠে।

মিঃ রিচার্ডসন অবশ্য আজ রাত থেকে তার পাশের ঘরে আছেন।

এই কথা মনে ভেবে সুজিত একটু ভরসা পেলো।—যদি দরকার হয়, তাহলে সে তাঁকে ডাকতে পারবে।

আর মাত্র চারদিন। চারদিন কাটাতে পারলে সুজিত একেবারে তার দেশের মাটি ছুঁতে পারবে। সত্যি জননী জন্মভূমির মতো এতো পবিত্র আর কিছু নেই। এতোদিন যখন দেশের মাটিতে ছিলো তখন দেশপ্রেমের মর্ম বোঝেনি সুজিত। পাঁচ বছর বিলেতে কাটাবার পর সে তার মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছে।

কিন্তু এই লাইটার ?

সর্বনাশা এই লাইটার। এই লাইটারটি পকেটে আসার পর একের পর এক রহস্যজনক ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে সুজিত।

অথচ, এখন যদি সে লাইটারটি ফেরৎ দেয় তাহলে তাকে ভীরু আখ্যা পেতে হবে। এ বদনাম ভারতীয় তরুণদের বদনাম। না, এখন আর কোনোমতেই তার পক্ষে পিছিয়ে আসা সম্ভব নয়।

আচ্ছা, কী দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক এই মমি। সারা পৃথিবী জোড়া তার শয়তানির জাল পাতা।

গোয়েন্দা কাহিনীকেও হার মানিয়ে দেয়।

ভাবতে ভাবতে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে তা সে নিজেই জানে না।

অনেক রাতে সুজিতের ঘুম ভেঙে গেলো। মনে হলো, তার মুখের উপর কার হিমশীতল স্পর্শ।

চোখ মেলে দেখলো, সারা ঘরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে সর্বাঙ্গ সাদা পোষাকে জড়ানো ছায়ামূর্তি তার দিকে ঝুঁকে পড়ে কি দেখছে।

বীভৎস তার দু'টি চোখ অন্ধকারে জ্বলছে। সুজিত চিৎকার করে উঠতে গেলো, পারলো না।

গলা দিয়ে শুধু একটা আঁ আঁ আওয়াজ বার হলো।

সুজিত এবার প্রাণপণ শক্তি সঞ্চয় করে উপরে উঠলো। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকটির উপর।

আততায়ীর হাতে ছিলো একটি ছোরা। অন্ধকারে তার ইস্পাতের ফলাটা লক লক করে উঠলো।

সুজিত দেখলো সে নিচে পড়ে গেছে। আর তার উপর বসে রয়েছে সেই ছায়ামূর্তি। সর্বাঙ্গ সাদা কাপড় জড়ানো। শুধু চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে।

ছায়ামূর্তি তার ছোরাটা ওপরে তুলেছিলো। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সে ছোরা নেমে আসবে সুজিতের বুকে। তারপর সুজিতের মৃতদেহ লুটিয়ে পড়বে। রক্তে ভেসে যাবে সারা ঘর।

এমন সময় পাশের ঘরে খুট করে একটা শব্দ হলো। আর পর মুহূর্তেই সুজিত শুনলো কে যেন বলছে খবর্দার আর এক মুহূর্তের মধ্যে ছেড়ে না দিলেই গুলি করবো।

ছায়ামূর্তির হাত থেকে ছোরাটা পড়ে গেলো। সে হাত দুটো ওপরের দিকে তুলে উঠে দাঁড়ালো।

পিস্তল হাতে লোকটি একটু একটু করে এগোতে লাগলো। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই লোকটি ধরে ফেলবে ছায়ামূর্তিকে।

হঠাৎ ছায়ামূর্তি একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে বসে পড়লো। লোকটি এতে একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলো। কি হলো ছায়ামূর্তির? কই তার পিস্তল থেকে তো গুলি বেরোয়নি।

লোকটি যেই একটু অন্যমনস্ক হয়েছে অমনি ছায়ামূর্তি যেন বিদ্যুৎ গতিতে উঠে দাঁড়ালো। তারপর এক ঝটকায় তাকে মাটিতে ফেলে রেখে খোলা দরজা দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো।

লোকটি মাটি থেকে উঠে সুজিতকে বললো, রয়, রয়, শীগ্‌গির আমার পিছনে পিছনে এসো।

সে কণ্ঠস্বর আর কারোর নয়, মিঃ রিচার্ডসনের।

সুজিত দ্রুত তাঁকে অনুসরণ করলো।

দোতলার লাউঞ্জে আলো জ্বলছে। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। নিশুতি রাত। সারা কায়রো শহর নিস্তব্ধ।

রিচার্ডসন সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নিচে নেমে গেলো কিন্তু কিছুক্ষণ

পরে ওপরে উঠে এসে বললো, রয়, দুর্ভাগ্য লোকটিকে ধরতে পারলাম না।

সুজিত বললো, মিঃ রিচার্ডসন, আজ আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। আপনি না এলে আমাকে আজ ও লোকটি মেরেই ফেলতো।

রিচার্ডসন বললেন, তোমার জীবন যদি চলে যেতো তাহলে ঈশ্বরের কাছে আমি চিরদিনই অপরাধী থাকতাম, রয়। আমি সে অপরাধের বোঝা কোনোদিনই ঝেড়ে ফেলতে পারতাম না।

গতকাল রাতে আমি ঘুমোইনি। ঘর বদলা করেও ভরসা পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিলো, আজ রাতে হয়তো আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে পারে।

তারপর ?

আমি সারারাত্তির জেগে থাকলাম। অনেক রাতে, শুনলাম একটা পায়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে। পিস্তলটা নিয়ে চুপি চুপি বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

পায়ের শব্দটা আমার ঘরের কাছে এসে থেমে গেলো।

ঠক্ ঠক্ ঠক্।

শুনলাম, দরজায় টোকা পড়ছে। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কিন্তু ছায়ামূর্তিটি আবার চলে গেলো পাশের ঘরের দিকে।

আমি বুঝলাম, ছায়ামূর্তি হয়তো ঘর ভুল করেছে।

তোমার দরজা বোধহয় খোলা ছিলো।

সুজিত বললো, আমার ঠিক মনে পড়ছে না। হয়তো রাত্তিরে বাইরে একবার বেরিয়েছিলাম। তখনই হয়তো দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছি।

—তাই হবে। আমি দেখলাম, ছায়ামূর্তি তোমার ঘরে ঢুকলো। তারপর তোমাকে ধরাশায়ী করে তোমার বুকে যখন ছোরা বসাতে যাবে তখনই আমি এলাম ঘটনাস্থলে। কিন্তু আমার আফসোস, মমিকে আমি ধরতে পারলাম না।

সুজিত বললো, এতো রাত্রিতে সে হোটেল ছেড়ে কোথাও পালাতে পারেনি। মমি এই হোটেলেই কোথাও লুকিয়ে আছে।

রিচার্ডসন বললেন, হয়তো তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু এই হোটেলের লোকজনকে আমি কোনো কিছু জানাতে চাই না। তা নিয়ে অযথা হৈ-চৈ হবে। পুলিশে জানাজানি হবে। আমাদের উদ্দেশ্য তাহলে সিদ্ধ হবে না। শুধু অযথা গোলমালের সৃষ্টি করে কোনো কাজই হবে না।

সুজিত চুপ করে থাকলো। উত্তেজনার রেশটুকু তার মন থেকে এখনো মুছে যায় নি।

রিচার্ডসন বললেন, রাত প্রায় দুটো বাজে। তুমি ঘুমোতে যাও। তোমার আর কোনো ভয় নেই। মমি আজ রাতে আর আসার সাহস করবে না। কাল রাতে আমি তোমার ঘরে সারারাত জেগে পাহারা দেবো।

সুজিত বললো, কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

—কোন কথা?

আমার ওপর মমির আক্রোশ হলো কেন? আমি তো মমির কোনো ক্ষতি করিনি। ইন্টারপোলের লোকও আমি নই। আমি এক নিরীহ ভারতীয় ছাত্র।

—মনে হয়, মমি বা তার অনুচর যেই আসুক না কেন, সে ঘর ভুল করেছে। কোন ঘর ঠিক করতে না পেরে দরজা খোলা পেয়ে মমি তোমার ঘরেই ঢুকেছে। তারপর হয়তো তোমাকে বুঝতে পেরে তার ভুল ভেঙেছে। কিন্তু আমার সঙ্গে তোমাকে দেখে তোমার ওপরেও হয়তো তারা সন্দেহ করে থাকতে পারে।

সুজিত বললো, মিঃ রিচার্ডসন, আমি কালই এই হোটেল ছেড়ে যেতে চাই। এই বিপদের মধ্যে থাকা আমি আর যুক্তিযুক্ত মনে করছি না।

মিঃ রিচার্ডসন বললেন, ছি, ছি, রয়। তুমি না ইণ্ডিয়ান।

ইণ্ডিয়ানরা যে এতো ভীতু হয়, তা জানতাম না। তোমরা না হাসতে হাসতে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছো!

ভারতবাসীদের অন্তত কাপুরুষ কেউ বলবে না। ঠিক আছে, আমি তোমায় গ্যারান্টি দিচ্ছি, শুধু কালকের রাতটাই তুমি আমার সঙ্গে থাকো। পরশু দিন আর আমি অনুরোধ করবো না।

সুজিত নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। সে ভালো করে দরজা দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। বিছানাটা এলোমেলো হয়ে আছে। বালিশটা ছিটকে পড়েছে পাঁচ হাত দূরে। চাদরটা কুঁচকে আছে। জলের গ্লাসটা ভেঙে ছত্রকাণ্ড।

রাত্রিতে আর সব কিছু গোছাতে ইচ্ছে করছিলো না। সুজিত শুয়ে পড়লো। ঘুমে তার চোখ ঢুলে আসছে।

॥ সাত ॥

একটি হত্যাকাণ্ড



সকালবেলা সুজিতের যখন ঘুম ভাঙলো তখন বেলা প্রায় ন'টা। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখতেই সে খুব অবাক হয়ে গেলো। এতোখানি বেলা হলো অথচ তাকে ব্রেকফাষ্ট খাবার জন্য কেউ তো আজ ডাকলো না। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ড্রেসিং গাউনটা চাপিয়ে সে বাইরে বেরোতেই একটা গণ্ডগোলের আওয়াজ শুনলো। নিচের

dainarchhabi.blogspot.com

লাউঞ্জে বেশ ভিড় হয়েছে। সবাই যেন উত্তেজিত হয়ে কী সব কথাবার্তা বলছে বলে মনে হলো।

একটি বেয়ারা সুজিতের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিলো। তার আতঙ্কিত চোখ মুখ দেখে সুজিত অনুমান করলো, কিছু একটা হয়েছে।

জিগ্যেস করলো, কী হয়েছে, বলো তো ভাই?

লোকটি বললো, আমাদের একজন বেয়ারা খুন হয়েছে।

—খুন? কোথায়?

—নিচের তলায়। কে গলা টিপে মেরে রেখে গেছে।

—কি নাম, বলো তো?

—আব্দুল।

—আব্দুল? আব্দুল খুন হয়েছে?

—হ্যাঁ স্যর। দেখে যান না। আমি চাকরি ছেড়ে চলে যাবো স্যর। আলেকজান্দ্রিয়াতে আমার শ্বশুরের খামার আছে। আমি চলে যাবো। এভাবে বেঘোরে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে হাল চাষ করা ভালো।

সুজিত তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেলো। গিয়ে দেখে এক বীভৎস দৃশ্য। আব্দুলের মৃতদেহটা লাউঞ্জে পড়ে আছে। জিভ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। চোখের দৃষ্টিও ঘোলাটে। অনেক লোকের ভিড়। পুলিশ এসেছে। তারা তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

ভিড়ের মধ্যে রিচার্ডসনও ছিলেন। তিনি সুজিতকে দেখতে পেয়ে কাছে টেনে আনলেন।

সুজিত বললো, মিঃ রিচার্ডসন, কী ব্যাপার বলুন তো?

আমি আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে এই দৃশ্য দেখছি। নিশ্চয়ই মমির কাজ।

—কি করে বুঝলেন?

মৃতদেহের সঙ্গে একটা ছাপানো কার্ড ছিলো। তাতে লেখা—মমি। রয়, মমি এ পর্যন্ত যতো হত্যা করেছে কোনোটাই সে লুকিয়ে করেনি।

কিন্তু মমি আব্দুলকে কেন হত্যা করবে? যতোদূর মনে হয়, তোমার ঘর থেকে তাড়া খেয়ে মমি যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলো তখন হয়তো সে আব্দুলের সামনাসামনি পড়ে যায়। আব্দুল হয়তো তাকে চিনতে পেরেছিলো। তাই মমি আর তাকে রেহাই দেয়নি। পৃথিবী থেকে তাকে একদম সরিয়ে দিতে চেয়েছে। রয়, হত্যা মমির কাছে নিছক এক ছেলেখেলা মাত্র। এমনি দু'-একটা জীবন তার কাছে কিছুই নয়। কিন্তু খবর্দার, কাল রাতের ঘটনার মধ্যে যে আমরা জড়িয়ে পড়েছিলাম, পুলিশ যেন ঘুণাক্ষরেও একথা জানতে না পারে।

—কেন?

—কারণ তাহলে পুলিশ হয়তো তোমাকে ও আমাকেই সন্দেহ করবে। আমার পরিচয় যখন জানতে পারবে তখন অবশ্য আমি ছাড়া পেয়ে যাবো, কিন্তু তোমাকে ওরা গ্রেফতার করবেই। কায়রো পুলিশকে তুমি চেনো না। কোনো রকমের তদন্তের ধার ওরা ধারে না। তারপর ওদের রিপোর্টের ভিত্তিতে হয়তো ফাঁসি হয়ে যাবে তোমার।

—ফাঁসি ?

—হ্যাঁ, মৃত্যুদণ্ড এসব কেসে অনিবার্য। ফাঁসি না হলেও খবরের কাগজে এ নিয়ে কেলেঙ্কারির একশেষ হবে। প্লিজ নিজের বিপদ তুমি নিজে ওভাবে ডেকে এনো না।

এমন সময় একজন পুলিশ অফিসার সুজিতের দিকে এগিয়ে এলেন।

—আপনি এই হোটেলে কবে এসেছেন ?

—তিনদিন হলো। কিন্তু কেন ?

—মাপ করবেন। হোটেলের সব বোর্ডারকেই আমাদের জেরা করতে হচ্ছে।

—ঠিক আছে। করুন না।

—আপনি কি করেন ?

—আমি ছাত্র। কায়রো দেখবো বলে ক'দিন এ-শহরে এসে রয়েছি। পরশু আবার চলে যাবো।

—আপনার পাশপোর্টটা দেখতে পারি ?

—এই দেখুন।

—থ্যাঙ্ক ইয়্যু। গতকাল রাতে আপনি কখন ঘুমোতে গিয়েছেন ?

—রাত এগারোটার সময়।

—মাঝ রাতে কোনো চিৎকারে বা শব্দে আপনার ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো ?

সুজিতের মুখ-চোখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। সে প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে বললো, না।

সুজিত এবার বললো, কিছু মনে করবেন না। আব্দুল কি করে খুন হলো, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

— আব্দুলকে আপনি চিনলেন কি করে ?

—আমার মর্ণিং-টি দিয়ে যেতো। এ ছাড়া খাবার টেবিলেও দেখা হতো। ভালো ইংরিজি বলতে পারতো। আমি কেন, সব বোর্ডারই একে চেনে দেখলাম।

পুলিশ-অফিসারটি বললেন, আব্দুল কাল রাত বারোটার সময় কাজকর্ম সেরে তার ঘরে ঘুমোতে যায়। আজ ভোরবেলা তাকে

এভাবে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। আমাদের সন্দেহ—ওকে গলা টিপে মারা হয়েছে। মৃত্যুর আগে যে কিছুটা ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছিলো তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

—আচ্ছা, আপনি এবার আসতে পারেন।

সুজিত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

রিচার্ডসনকেও পুলিশ অফিসার দু'-একটা কথা জিগ্যেস করলেন। তারপর ছেড়ে দিলেন।

রিচার্ডসন সুজিতকে ওপরে নিজের ঘরে ডাকলেন। বললেন, আমি ভেবেছিলাম, তুমি জেরার মুখে ঘাবড়ে যাবে। না ঘাবড়ে তুমি যে ঠিক ঠিক জবাব দিয়েছো এতে আমি দারুণ খুশি।

—কিন্তু আব্দুলকে কে খুন করলো?

—আমার মনে হয়, কাল রাত্তিরে আমাদের ঘরে যে এসেছিলো, সেই মমিকে আব্দুল দেখতে পেয়েছিলো। তুমি জানো, সাপের লেখা আর মমির দেখা। মমি এতো নির্মম যে যদি সে ঘুণাক্ষরেও জানে যে কোনো লোক তার ভবিষ্যতে এতোটুকু ক্ষতি করতে পারে তাহলে তার হাত থেকে তখন আর নিস্কৃতি নেই।

কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। তারপর এক সময় রিচার্ডসন বললেন, রয়, তোমাকে আর আমার ভাগ্যের সঙ্গে জড়াবো না। আজই আমি নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ছি। জানি না, আর দেখা হবে কিনা। এই ক'দিনের পরিচয়ে তুমি আমার যা করেছো তার ঋণ জীবনে শোধ করতে পারবো না। শোনো, আমার সেই প্রিয় লাইটারটি ও চাবির রিং তুমি তোমার কাছেই রেখে দাও। যদি সম্ভব হয় লোক পাঠিয়ে নিয়ে যাবো। যদি না হয় তাহলে ক্যালকাটা থেকে আমার লোক গিয়ে নিয়ে আসবে। গুড বাই।

—আপনি কখন যাত্রা করবেন?

—এখনি।

—খাওয়া দাওয়া করে যাবেন না?

—না। প্রথম কথা, তাহলে দেরি হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, কালকের ব্যাপারটার জের এখনও মেটেনি। যদি কোনো রকম

ঝামেলায় ফেলে দেয় তাহলে সব কিছুই পণ্ড। আমি সবার অলক্ষ্যে সরে পড়তে চাই।

রিচার্ডসনকে বিদায় দিয়ে সুজিত তার ঘরে এসে বসলো। আর মাত্র আজকের দিনটি আছে। এমনিতেই আর কয়েক ঘণ্টা সময় আছে। এর মধ্যে যা কিছু দেখার দেখে নিতে হবে। শুধু তাই নয়, আসল কাজটাই বাকি। ক্যালকাটার বুকিং এণ্ডর্স করাতে হবে তার টিকিটে।

ঘণ্টাখানেক পরে নিচে নামতেই সুজিত দেখলো, ভিড় আর এখন নেই। মৃতদেহ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ওকে দেখে রিসেপশনের মেয়েটি ডেকে বললো, আপনার চিঠি আছে।

চিঠি ?

হ্যাঁ, সকালের ডাকে এসেছে। মেয়েটি সুজিতের হাতে একটি খাম দিলো। খামটি ছিঁড়ে ফেললো সুজিত। বাবা, মা আর ছোটো বোনের চিঠি।

মা লিখেছে, খোকা তুই আসছিস বলে আমরা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি। কলকাতায় কখন ক'টার সময় তোর প্লেন এসে পৌঁছোবে, আমাকে পত্রপাঠ জানাবি। বোন লিখছে, দাদামণি, কতোদিন তোমাকে দেখিনি।' এবার এসে দেখবে, আমি কতো বড়ো হয়ে গেছি।

চিঠি দু'টি পড়তে পড়তে সুজিত কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলো। তার মন চলে গেলো কয়েক হাজার মাইল দূরে। যখন তার বাড়ির কথা মনে থাকে না তখন সে বেশ থাকে। কিন্তু বাড়ির কথা মনে হলেই হু-হু করে ওঠে মন।

আর মাত্র একটি দিন। একটি দিন পরেই সে দেশের মাটি স্পর্শ করতে পারবে।

অন্যমনস্ক হয়ে সুজিত পথ চলতে লাগলো। তার গন্তব্যস্থল এয়ার ইণ্ডিয়ার অফিস। রাস্তা দিয়ে জনস্রোত চলেছে। সুজিত হাতঘড়ি দেখলো এখন বেলা প্রায় বারোটা বাজে। ইস, অনেক বেলা হয়ে গেলো। এখন টিকিট পেলে হয়।



॥ আট ॥

রিচার্ডসনের নিরুদ্দেশ যাত্রা

সুজিতের সঙ্গে কথা শেষ হবার পর রিচার্ডসন তাঁর ঘরে গেলেন। তারপর দাড়ি কামানো ও স্নান সেরে সুটকেশটি খুলে একটি পোশাক বার করে নিলেন। সেগুলিকে ভরলেন একটি কীট্‌স ব্যাগে।

তারপর কীট্‌স ব্যাগটি হাতে করে শিষ দিতে দিতে নিচে নেমে গেলেন। ওখানে হোটেলের রিসেপশনিষ্টের হাতে চাবি দিয়ে মৃদু হেসে বললেন, গুড মর্ণিং।

Boiarchhabi.blogspot.com

—মর্ণিং। মেয়েটি জবাব দিলো। কোথায় চললেন?

—মিউজিয়ম আর আর্ট গ্যালারি দেখতে।

—কখন ফিরবেন?

—সন্ধ্যার আগেই। চলি কেমন?

মেয়েটি বললো, আচ্ছা।

রিচার্ডসন চলে যেতেই মেয়েটি ফোন তুলে একটা নম্বর চাইলো। তারপর বললো, মিঃ খালেক আছেন?

ওপাশ থেকে জবাব এলো, আমি খালেক কথা বলছি।

মেয়েটি খুব চাপা গলায় বললো, পাখি বাইরে যাচ্ছে। নজর রেখো।

—কোন পাখি? বড়োটা না ছোটোটা?

—বড়ো পাখি। বললো, মিউজিয়ম যাচ্ছে। হাতে একটা কীট্‌স ব্যাগ।

—ধন্যবাদ, আমি দেখছি, কি করা যায়।

মিঃ রিচার্ডসন রাস্তায় বেরিয়ে পিছন ফিরে এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা রেষ্টুরেণ্টের ভেতর ঢুকে পড়লেন।

এক কোণে একটা খালি টেবিল ছিলো। তাতে বসে পকেট থেকে লেটার-হেড আর পেন্সিল বার করলেন মিঃ রিচার্ডসন। লেটার-হেডে মিঃ রিচার্ডসনের নাম নেই। শুধু ইন্টারপোলের নাম মনোগ্রাম করা। মিঃ রিচার্ডসন সেই প্যাডে খস খস করে কি সব লিখলেন। তারপর চিঠিটা পকেটে পুরে ফেললেন।

এক কাপ কফির অর্ডার দিয়ে চোখ থেকে গগল্‌সটি খুললেন মিঃ রিচার্ডসন। সতর্ক দৃষ্টিতে দু'একবার তাকালেন। এখন সকাল বেলা রেষ্টুরেণ্টে খুব একটা ভিড় নেই। তবে কয়েকটা টেবিলে আরব ছেলেমেয়েরা বসে আড্ডা জমিয়েছে।

কফি খাওয়া হয়ে গেলে বিল মিটিয়ে দিয়ে বাইরে আসতেই দেখলেন, একটি লোক দরজার সামনে তাঁর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে। লোকটির গায়ে বেদুইনের পোশাক। খুব গরিব মনে হচ্ছিলো লোকটাকে। হয়তো ভিখিরি-টিকিরি হবে।

কেন জানি না, লোকটিকে দেখে তাঁর মনটা ছাঁৎ করে উঠলো।

একটা ট্যাক্সি ডাকলেন মিঃ রিচার্ডসন। ট্যাক্সিওয়ালা তাঁকে বললো, কোথায় যাবেন?

—ওল্‌ড কায়রো।

ট্যাক্সি ছুটে চললো জারএল এলি স্ট্রীট ধরে আমরেবেন এলাস স্ট্রীটে। ট্যাক্সি এসে পড়লো ওল্‌ড কায়রোতে। এ প্রাসাদ নগরী কায়রোর উপকণ্ঠে এ এক হতশ্রী শহর। বস্তি জীর্ণ বাড়ি। ঘিঞ্জি গলি।

ট্যাক্সি একটি গলির সামনে এসে থামলো।

ট্যাক্সি ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে মিঃ রিচার্ডসন একবার সন্তর্পণে এদিক ওদিক দেখে নিলেন। তারপর একটি গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

গলির গলি তস্য গলি। দু'দিকে ঘিঞ্জি বস্তি।

একদিকে একটি ওষুধের দোকান। গাছ-গাছড়া নানা রকমের হেকিমি দাওয়াই এখানে বিক্রি হয়।

রিচার্ডসনকে দেখে দোকানী বলে উঠলো, আসুন সাহেব।

দোকানী বৃদ্ধ। একমুখ দাড়ি। রুক্ষ একমাথা চুল। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ—গায়ে বিরাট আলখাল্লা। রিচার্ডসন বললেন, কীগো আসরাফ হোসেন। কী খবর?

আসরাফ তিনবার কুর্ণিশ করে বললো, হুজুর আর আল্লার কৃপায় কারবার ভালোই চলে যাচ্ছে। যান ভেতরে যান, আরিফ সাহেব আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

আসরাফ দোকানের পেছনের বন্ধ দরজাটা খুলে ফেললো। ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটা মোমবাতি ধরিয়ে আগে আগে চললো আসরাফ।

মাটির নিচে সিঁড়ি নেমে গেছে। সে সিঁড়ি বোধ হয় শেষ হয়েছে পাতাল পুরীতে। রিচার্ডসনের বুকটা পর্যন্ত ছাঁৎ করে উঠছিলো।

প্রায় পাঁচ মিনিট যাবার পর আর একটি ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো আসরাফ। দরজায় টোকা দিতেই ভিতর থেকে আওয়াজ এলো, কে?

—আমরা।

—চলে এসো।

খুট করে চাবি খোলার শব্দ! আসরাফ আগে আগে ঢুকলো। পেছনে রিচার্ডসন।

ঘরের মধ্যে একটি চেয়ারে বসেছিলো আরিফ আর একটি চেয়ারে খলিল। খলিলকে এ-বইয়ের প্রথম দিকে মিঃ রিচার্ডসনের সঙ্গে মেট্রোপোল হোটেলে দেখা গিয়েছে।

খলিল বললো, আসুন স্যর। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি। চিনতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো?

রিচার্ডসন বললেন, না। আসরাফকে তো আগে থেকেই চিনতাম। আমাদের পুরোনো লোক। খুব কাজের লোকও বটে। মনে আছে, সেবার সেই গোল্ডবারের ব্যাপারটায় আসরাফ আমাদের কতোখানি সাহায্য করেছিলো। সেটা আমার হাতের সবচেয়ে বড়ো

কেস। প্রায় এক লক্ষ ডলার দাম ছিলো। আসরাফের সাহায্য না পেলে সেবার কিছুতেই আমরা কৃতকার্য হতে পারতাম না। ওঃ প্রায় বিশ বছর আগের ঘটনা।

—কী গো আসরাফ, মনে পড়ে সে কথা?

আসরাফ বললো, তা আর পড়ে না হুজুর। সেবার আমাকে আপনি নগদ হাজার ডলার ইনাম দিয়েছিলেন। তারপর অনেকদিন পরে আপনাকে দেখলাম হুজুর। আমাকে খলিল সাহেব যখন বললেন, আসরাফ, সাহেব আবার এসেছেন একটা মোটা রকমের কেসের ব্যাপার নিয়ে। তখন ভাবলাম, যাক অনেকদিন পরে সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে।

খলিল বললো, স্যর, ইনি হলেন আরিফ সাহেব। এঁর কথাই আপনাকে বলছিলাম।

আরিফ লোকটির বয়স বছর চল্লিশ। মুখে বসন্তের দাগ। গোঁফ দাড়ি নিখুঁতভাবে কামানো। চোখে গগল্‌স। বিরাট এক তাগড়াই গোঁফ। একটি দামী স্যুট ছিলো তার পরনে।

রিচার্ডসন বললেন, আপনার কথা আমি অনেকবার খলিলের মুখে শুনেছি। আপনি হয়তো জানেন, আমাদের পিছনে প্রথম দিন থেকেই ফেউ লেগে আছে।

আরিফ বললো, আমিও আসবার সময় দেখলাম একটা কালোমতো গাড়ি আমাদের ফলো করছে। অবশ্য আসরাফের এই গুপ্ত ডেরার সন্ধান পাওয়া কারোর কর্ম নয়। যাক আমাদের কাজের কথাটা আগে চুকিয়ে ফেলা যাক, মিঃ রিচার্ডসন।

—বেশ তো।

—আমি বলি কি—

আরিফ তার কথা শেষ করেনি। এমন সময় একটি লোক ঘরে ঢুকলো।

আরিফ তাকে দেখে বললো, কী খবর হোসেন?

লোকটি আরিফের কানে কানে কি যেন বললো, চমকে উঠলো

আরিফ। তার চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলে উঠলো। বললো, না-না এ হতে পারে না।

মিঃ রিচার্ডসন জিগ্যেস করলেন, কি হয়েছে? কি ব্যাপার?

আরিফ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মিঃ রিচাডসনের দিকে চেয়ে বললো, মিঃ রিচার্ডসন ব্যাপার খুবই গুরুতর। মেট্রোপোল হোটেলের একজন বেয়ারা কাল রাতে খুন হয়েছে। এ খবর আপনি জানতেন?

—হ্যাঁ, আমি যখন হোটেল ছেড়ে আসি তখনই শুনেছিলাম।

—আপনি জানেন, খুনী কে?

—তদন্ত চলছে। নিশ্চয়ই প্রকাশ হয়ে পড়বে।

—মিঃ রিচার্ডসন, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে আমি আটক করলাম।

—তার মানে?

আরিফ বিদ্যুৎগতিতে তার হাতের পিস্তলটা উঁচু করে তুলে ধরলো রিচার্ডসনের দিকে।

সঙ্গের লোকটি আর একটি পিস্তল উঁচু করে তুলে ধরলো খলিলের দিকে।

—হাত তোলো শয়তানেরা।

ওরা হাত তুললো।

আরিফ সঙ্গের লোকটিকে বললো, ওদের পকেট সার্চ করো। পকেট সার্চ করে পাওয়া গেলো ইন্টারপোলের নামাঙ্কিত কয়েকটি কার্ড। একটি আইডেনটিটি কার্ড, কিছু টাকা ও খামে ভরা একটি চিঠি আর পিস্তল। আরিফ চিঠিটি দ্রুত খুলে ফেললো। তারপর চিঠিটি পড়তেই আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

আরিফ বললো, আপাতত তোমরা দু'জনেই এই ঘরে বিশ্রাম করো। এই ঘরেই তোমাদের পূর্ণ সমাধি হবে। শোনো শয়তানেরা আব্দুলের মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি নিতে চাই এবং কেমন করে সে প্রতিশোধ নেবো, জানো? এই ঘরের দরজা আর কোনোদিন না খুলে দিয়ে। এই ঘরে বিনা জলে, বিনা খাবারে, দম-বন্ধকর, এই পরিবেশের মধ্যে আমার মনে হয়, তোমরা তিনদিনের বেশি বাঁচতে

পারবে না। বড়ো বেশি তোমাদের লোভ! আর লোভে—পাপে মৃত্যু হাঃ হাঃ হাঃ।

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো। তালা দেওয়ার শব্দ হলো। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সে-অন্ধকারে রিচার্ডসন ও খলিল কেউ কারো মুখ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন না।

রিচার্ডসন বললেন, খলিল, কোথায় তুমি?

খলিল বললো, আমি এখানে স্যর। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। আমি বুঝতে পারিনি, আরিফ এরকম করবে। এতোখানি চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা!

রিচার্ডসন বললেন, মরতে আমি ভয় পাই না। যে বিপজ্জনক কাজের বোঝা মাথায় পেতে নিয়েছি তাতে মৃত্যু আমার প্রতি-মুহূর্তের সঙ্গী। কিন্তু একটু অসতর্কতা সামান্য একটা ভুলের জন্য সবকিছু আজ হারাতে বসলাম।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সারা ঘরে কোথাও আলো আসার উপায় নেই। শুধু অনেক ওপরে একটি ছোটো জানলা আছে; কিন্তু সেখান দিয়ে আলো যা আসে তা যৎসামান্য ছিটেফোঁটা।

রিচার্ডসন বললেন, শোনো খলিল, তুমি অধৈর্য হয়ো না। আমার শুধু একমাত্র আফসোস যে আমি বোকার মতো চিঠিটি যদি না লিখে রাখতাম। ওঃ ওই চিঠিই আমার সর্বনাশ ঘনিয়ে আনলো। ওঃ কী ভুলই আমি করেছি।

মিঃ রিচার্ডসনের কণ্ঠ দিয়ে যেন কান্না ঝরে পড়তে লাগলো।

তিনি বললেন, ওই চিঠিতে আমি সুজিত রয়কে আমার সঙ্গে দেখা করতে লিখেছি। আমার প্ল্যান মতো কাজ হলে কোনো ঝামেলাই হতো না। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারিনি, আব্দুল ওই আরিফের লোক। তাহলে কখনোই আমি আসতাম না।

খলিল বললো, কিন্তু আব্দুল যে আরিফের লোক আমিও কিছুতেই বুঝতে পারিনি। আমারও এতো দিন অন্য সন্দেহ হচ্ছিলো। শুধু তাই নয়, আরিফের দিক থেকে অন্য কোনো

রকম আক্রমণ আসতে পারে, এ আমি ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি। এক-চক্ষু হরিণের মতো আমি শুধু অন্য দিকে তাকিয়েছিলাম।

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বললেন না। কিছুক্ষণ পরে রিচার্ডসন বললেন, তোমার দম বন্ধ হয়ে আসছে না?

খলিল বললো, হ্যাঁ, স্যর বড়ো কষ্ট হচ্ছে নিশ্বাস নিতে। ঘুলঘুলির একটা জানলা আছে, তাও ভেতর থেকে বন্ধ।

—এটা বোধহয় কোনো চোরাকুঠুরি ছিলো। দীর্ঘদিন বন্ধ পড়ে আছে। কুঠুরির মধ্যে গ্যাস জমে গেছে বলে মনে হচ্ছে। একদিন এখানে থাকলে তিলে তিলে আমাদের জীবন দীপ নিভে আসবে।

খলিল খানিকটা নিশ্বাস নিয়ে বললো, কি রকম একটা দুর্গন্ধ আসছে।

রিচার্ডসনও এই দুর্গন্ধ পেয়েছেন। তিনি বললেন, মনে হচ্ছে পাশে কোনো নোংরা ড্রেন রয়েছে।

হঠাৎ রিচার্ডসনের পায়ে কি ঠেকলো। তিনি হাত বুলিয়ে দেখলেন, একটা কঙ্কাল।

কঙ্কালটা তুললেন মিঃ রিচার্ডসন। ধুলোর মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে ছিলো।

মিঃ রিচার্ডসন ডাকলেন, খলিল।

খলিল বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিলো। সে তাড়াতাড়ি চমকে উঠে বললো, ইয়েস স্যর।

—খলিল, আমার হাতে এটা কি দেখতে পাচ্ছো?

—খলিল অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো, কঙ্কাল।

—হ্যাঁ। এই চোরা কুঠুরিটায় আমাদের মতো আরও অনেকের জীবনদীপই এ ভাবে নিভে গেছে। হয়তো এখানে কঙ্কালের সংখ্যা আরও দু'টি বাড়বে।

খলিল হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। তার চাপা কান্না সেই নিরন্ধ্র গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগলো।

মিঃ রিচার্ডসন তাকে কি বলে সান্ত্বনা দেবেন ভেবে পেলেন না।



॥ নয় ॥

রহস্যের পাকে সুজিত

সুজিত হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে চললো। এয়ার টার্মিনাসের দিকে। তার একটু আগে এয়ার ইণ্ডিয়া অফিসে একটি টেলিফোন এসেছে। জোনাল ম্যানেজার মিঃ হিলালিকে কায়রোর স্বরাষ্ট্র দফতর অনুরোধ জানিয়েছেন, কৌশলে সুজিতের ফ্লাইট বাতিল করে দিতে হবে। একটা মার্ডার কেসের জন্য সুজিতের আরও কিছুদিন কায়রোতে থাকা দরকার।

dalporchhabi.blogspot.com

—মার্ডার? মানে খুনী কেসের আসামী?

—আসামী না। বলা যেতে পারে সাসপেক্ট, আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, ছেলেটি এই মার্ডারের মধ্যে আছে।

—তাহলে গ্রেফতার করছেন না কেন?

—প্রমাণ বড়ো একটা পাচ্ছি না। শুধু সন্দেহের উপর কোনো বিদেশীকে তো গ্রেফতার করা যায় না। ভারতীয় দূতাবাস চেপে ধরবে।

—সন্দেহটা করছেন কেন?

আপনাকে বলি মিঃ হিলালি, স্বরাষ্ট্র দফতরের সচিব বললেন। মৃতের হাতে একটি চুল পাওয়া গিয়েছে। মনে হয়, মৃত্যুর আগে আততায়ীর সঙ্গে তার ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছিলো। চুলটি পরীক্ষা করে মনে হয়েছে, এটি কোনো ভারতীয় এবং কোনো তরুণের চুল। হোটেলে ভারতীয় তরুণ ঐ একজনই আছে। আরও প্রমাণ আছে, মিঃ রয়ের ঘরে আজ সকালে মেড ঢুকে দেখে, কাঁচের গ্লাস ও জার

ভাঙা, বিছানা আর বালিশ মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মনে হয়, কাল রাতে কোনো ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়ে গেছে ঘরের মধ্যে।

—তাহলে তো ভাবিয়ে তুললেন। দেখুন, মিঃ রয়ের ট্যুর প্রোগ্রাম লণ্ডন অফিস থেকে করা। এবং এক মাস আগে থেকে তাঁর সিট বুক্‌ড করা। এই অবস্থায় আন-অফিসিয়ালি কোনো নির্দেশ না পেয়ে তাঁর যাত্রা বন্ধ করাটা বড়ো বেআইনী হবে না কি?

—মিঃ হিলালি, আপনি ভারতীয় বিমান পরিবহনে কাজ করছেন বলে ভারতীয়দের ওপর এমন পক্ষপাত দেখাচ্ছেন।

—তা যদি বলেন, তাহলে নিরুপায়।

—দেখুন, কথা কাটাকাটি না করে দয়া করে আমাদের সাহায্য করুন। দেশের ল অ্যাণ্ড অর্ডারের প্রশ্ন এই সঙ্গে জড়িত।

—আচ্ছা দেখা যাক, কি করা যায়!

মিঃ হিলালি বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকলেন। বেয়ারা এলে বললেন, মিস পাশাকে খবর দাও।

একটু পরেই স্কার্ট পরা একটি মেয়ে এলো।

মিঃ হিলালি বললেন, মিস পাশা, কালকের ফ্লাইটে মিঃ রয় বলে ক্যালকাটার একজন প্যাসেঞ্জার আছেন। ওঁকে বলতে হবে কালকের ফ্লাইটের বুকিং কনফার্মড হয়নি। ওঁকে তিনদিন পরে একটা ফ্লাইটের ডেট দাও। মিস পাশা বললেন, স্যর, এইমাত্র ওঁকে বুকিং দিয়ে দিলাম। উনি টিকিটে এণ্ডর্সমেণ্ট করিয়ে নিয়ে গেলেন। কাল সন্ধ্যার ফ্লাইটে উনি ক্যালকাটা ফিরে যাচ্ছেন।

মিঃ হিলালি কপাল চাপড়ে বললেন, মাই গুডনেস।

টিকিট নিয়ে সুজিত খুব নিশ্চিন্ত বোধ করলো। যাক এবার তার দেশে ফিরতে কোনো বাধা নেই।

আজ বিকেলে তাকে পিরামিডে যেতেই হবে। ক'দিন হলো কায়রোতে এসেছে অথচ কায়রোর প্রধান আকর্ষণ পিরামিড তার দেখা হলো না।

রাস্তায় নামতেই সুজিত শুনলো, তাকে কে যেন ডাকছে।

—হ্যালো স্যর।

সুজিত ফিরে তাকালো।

প্রথম দিন যার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, সেই লোকটা।

—আমাকে ডাকছো?

—হ্যাঁ। লোকটি এগিয়ে এলো।

—পিরামিড যাবে? ভালো গাইড চাই?

—না। ধন্যবাদ।

সুজিত হনহন করে হাঁটতে লাগলো।

পিছন থেকে লোকটি তখনও ডাকছে, হ্যালো এই যে শুনছো—

এই শহরে সুজিতের বিড়ম্বনায় ভরে উঠছে। কেন যে সে এখানে এসেছিলো, ভগবান জানেন। ঐতিহাসিক কায়রো দেখার শখ তার মিটে গেছে।

সোলেমান পাশা স্কোয়ারে আসতেই তার মনে পড়লো সাংবাদিক বন্ধুটির কথা। বেচারা এই রাস্তা দিয়েই একদিন নিশ্চিন্ত মনে হাঁটছিলো। পকেটে ছিলো তার জার্মান থেকে কেনা মনত্ব্লাঙ্ক কলম। আশি টাকা দাম।

একটি বেদুইন সকলের সামনে পকেট থেকে কলমটা তুলে নিয়ে দিলো চোঁ-চাঁ দৌড়।

পুলিশের কাছে নালিশ জানালো বন্ধুটি।

পুলিশ বললো, আমি ট্রাফিক পুলিশ। চোর ধরা আমার কাজ নয়।

সঙ্গে সঙ্গে সে গেলো থানায়। থানা থেকে পুলিশের সদর দফতরে। কিন্তু কায়রো পুলিশের এমনই কৃতিত্ব যে অপরাধী কিছুতেই ধরা পড়লো না।

মিউজিয়মের পাশে বাস টার্মিনাস। সেখান থেকে পিরামিডের বাস ছাড়ে। প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর বাস আছে।

সুজিত ঠিক করলো, হোটেল থেকে লাঞ্চ সেরে সে পিরামিড দেখতে বেরিয়ে পড়বে।

হোটেলে আসতেই তাকে রিসেপশনিষ্ট বললো, এক ভদ্রলোক আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

—আমার জন্যে ?

—হ্যাঁ, আপনারই নাম তো সুজিত রয়।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ঐ দেখুন বেঁটে মতো কালো স্যুট-পরা ভদ্রলোক। সুজিত একটু এগিয়ে যেতেই ভদ্রলোকের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলো।

ভদ্রলোকের মাথায় টাক। কিন্তু মুখে এক মুখ দাড়ি। নিখুঁত সাহেবী পোশাক পরনে। তিনি সুজিতকে দেখে বললেন, আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিলো।

সুজিত বললো, বলুন।

—একটু নিরিবিলিতে চলুন।

ওরা দু'জনে লাউঞ্জের এককোণে চলে গেলো।

ভদ্রলোক বললেন, আমি মিঃ রিচার্ডসনের কাছ থেকে আসছি। উনি এই চিঠিটি দিয়েছেন।

ভদ্রলোক একটি চিঠি বার করে দিলেন। সুজিত চিঠিটি খুলে পড়ে ফেললো। ইণ্টারপোলের লেটার-হেডে লেখা চিঠি—রয়, আমি আজ রাত আটটায় এক নং পিরামিডের কাছে যে ঘোড়ার গাড়ির ষ্ট্যাণ্ড আছে ওখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো। নিজে যেতে না পারলে লোক পাঠাবো। যে লোকটি যাবে সে তোমাকে ইণ্টারপোলের আইডেনটিটি কার্ড দেখাবে। তুমি তাকে আমার লাইটার ও চাবির রিংটি দিয়ে দেবে। কায়রো তোমার পক্ষে আর নিরাপদ নয়। তুমি যতো শীঘ্র সম্ভব কায়রো ত্যাগ করো। তাছাড়া আমার জীবনও সংশয়। হয়তো এ জীবনে আর দেখা হবে না। ইতি তোমার দু'দিনের বিদেশী বন্ধু 'আর'।

সুজিত জিজ্ঞেস করলো, মিঃ রিচার্ডসন এখন কোথায় ?

ভদ্রলোকটি বললেন, মাপ করবেন। তাঁর মুভমেণ্ট বলা আমাদের বারণ। আর বুঝতেই পারছেন, কতো কঠিন কাজে তিনি হাত দিয়েছেন। আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করি, আপনি এসব ব্যাপার কাউকে বলেননি তো ?

—না, না।

আর কিছু না। সাহেব বলে দিয়েছেন মমির চর সবসময় বেড়াচ্ছে। অনেক সময় তারা পুলিশের ছদ্মবেশ ধরেও আসতে পারে। তাই আপনাকে একটু সাবধান থাকতে বলা আর কি!

সুজিত বললো, ঠিক আছে, আমি সাবধানেই থাকবো।

ভদ্রলোক চলে গেলেন।

সুজিত লাউঞ্জের মাঝামাঝি এগিয়েছে এমন সময় আবার এক ভদ্রলোক ওর দিকে এগিয়ে এলেন।

—আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

—কী কথা?

—আমি কায়রো পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার। এই দেখুন আইডেনটিটি কার্ড।

গোয়েন্দা অফিসারটি বললেন, আজ সকালে আমার অ্যাসিস্ট্যানটের কাছে আপনি কিছু ষ্টেটমেণ্ট করেছেন। সে সম্পর্কে আমি আরও কিছু জানতে চাই। প্রথমেই বলে রাখি, আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে আমরা খুবই দুঃখিত। কিন্তু আমাদের কর্তব্য করতে হবে।

—কী ব্যাপার বলুন তো?

—কাল রাতে এই হোটেলের বেয়ারা আব্দুলকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, তা আপনি জানেন?

—জানবো না কেন? আজ সকালেও তো তার ডেড বডি এখানে পড়েছিলো।

আব্দুলের সঙ্গে আপনার আলাপ ছিলো?

—হ্যাঁ, তা আলাপ বলতে পারেন। আব্দুল লোকটি খুব সদালাপী ছিলো।

—আপনি কি করেন?

—আমি ছাত্র। ইঞ্জিনিয়ারিং ষ্টুডেণ্ট।

—মাপ করবেন। এমন কোনো প্রমাণ আপনি দিতে পারেন, যাতে আপনি যে ছাত্র তা নিঃসন্দেহে জানা যায়।

সুজিত একটু বিরক্ত হয়ে বললো, তা পারি। আমার কাছে গ্লাসগো ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ডিপ্লোমা আছে।

—শুনুন, এতো কথা আমার জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়। আব্দুল লোকটির স্বভাব চরিত্র ভালো ছিল না। সে কিছু বদমায়েস লোকেদের পাল্লায় পড়েছিলো।

—দেখুন, আমি লোকটি সম্পর্কে কিছুই জানতাম না।

—কিন্তু গতকাল রাতে আব্দুল আপনার ঘরে ঢুকেছিলো কেন ?

সুজিত এবার চমকে উঠলো, আমার ঘরে ?

—হ্যাঁ, আপনার ঘরে। আব্দুল তার মৃত্যুর আধঘণ্টা আগে আপনার ঘরে ঢুকেছিলো। আপনার সঙ্গে তার ধ্বস্তাধ্বস্তিও হয়। তারপর তার আধঘণ্টার মধ্যে গলা টিপে তাকে হত্যা করা হয়। এর দায়িত্ব আপনি এড়িয়ে যেতে পারেন ?

সুজিত খুব করুণ গলায় বললো, এসব আপনি কি বলছেন ?

—যা বলছি, ঠিকই বলছি। তার উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণও আমাদের হাতে আছে।

—দেখুন, কাল রাতে আপাদমস্তক সাদা পোশাকে মোড়া একটি লোক আমার ঘরে ঢুকেছিলো। আমি জেগে উঠতে সে লোকটি পালিয়ে যায়, তারপর আমি আর কিছু জানি না।

—এতো বড়ো একটা ঘটনা ঘটলো, আপনি হোটেলের কাউকে জানান নি কেন ?

—পরদিন জানাবো, ভেবেছিলাম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আব্দুলের মৃতদেহ দেখে আমি ঘাবড়ে যাই। মনে মনে ভয় ছিল যে এসব কথা বললে হয়তো উল্টে নিজেরই বিপদ হতে পারে। তাই সব ব্যাপারটা চেপে গিয়েছিলাম।

—কিছু মনে করবেন না। আমরা আপনার ঘরটা একটু সার্চ করতে চাই।

সুজিত বললো, তা করুন না।

সুজিতের সঙ্গে ভদ্রলোক ওপরে উঠে গেলেন। তারপর চাবি

খুলে সুজিতের ঘরে এসে ঢুকলেন। জিনিসপত্র বলতে সুজিতের কাছে শুধু একটি মাত্র সুটকেশ। তার অন্যান্য মালপত্র সে টমাস কুক কোম্পানির জাহাজে করে পাঠিয়ে দিয়েছিলো।

সুটকেশটি খুলে ফেললো সুজিত।

কয়েকটি জামা প্যান্ট। একটি ক্যামেরা। কিছু বই, একটা পুলওভার।

না, বিপদজনক কিছু নেই।

সুজিতের বুকটা ধুক ধুক করছিলো। যদি লোকটি মিঃ রিচার্ডসনের লাইটারটি নিয়ে টানাটানি করে। হয়তো আর কিছু না পেয়ে ওটাই যদি বাজেয়াপ্ত করে।

লাইটারটি ছিলো তার হাত ব্যাগে।

না, ভাগ্য ভালো। হাত ব্যাগটা নিয়ে আর টানাটানি হলো না।

ভদ্রলোক এবার শুধু সুজিতের বিছানার কাছে এলেন। ভালো করে পরীক্ষা করতে লাগলেন বিছানাটি। তারপর বিছানা থেকে কি একটা নিয়ে কাগজে মুড়ে সন্তর্পণে পকেটে রাখলেন। তারপর ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা মিঃ রয়, যে লোকটি কাল রাতে আপনার ঘরে ঢুকেছিলো তার চেহারাটা আপনি মনে করতে পারেন?

—না। কারণ আগাগোড়া সাদা পোশাকে তার দেহ ঢাকা ছিলো।

—তবু, লোকটির উচ্চতা কতো হবে?

—লোকটা বেশ ঢ্যাঙা আর একটু পাতলা চেহারা বলে মনে হচ্ছিলো।

—আপনার ঘরে আততায়ীর হানা দেওয়ার উদ্দেশ্য কি থাকতে পারে?

—আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

—আপনার কাছে কোনো মূল্যবান জিনিসপত্র আছে, যার লোভে কেউ আসতে পারে? সুজিত এবার একটু চমকে উঠলো। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সম্বরণ করে বললো, না। আমার কাছে কি আছে না আছে, সবই তো আপনি দেখেছেন।

—মিঃ রিচার্ডসনের সঙ্গে আপনার কতো দিনের আলাপ ?

—কায়রো আসবার পথে প্লেনে আলাপ।

—তাঁকে আপনার কি রকম লোক মনে হয় ?

সুজিত বললো, আমি যতোটুকু জানি, তাতে তিনি একজন সজ্জন ব্যক্তি।

অফিসার এবার বললেন, ও. কে.। এবার আপনি যেতে পারেন, মিঃ রয়।

নিদারুণ আশঙ্কায় আর অপমানের লজ্জায় সুজিতের সারা শরীর ঝিমঝিম করছিলো। শেষ পর্যন্ত কায়রোতে এসে তাকে খুনের দায়ে পড়তে হলো। এখন পুলিশ যদি তাকে ধরে খুনের দায়ে অভিযুক্ত করে।

তাহলে ? তাহলে ফাঁসি তার অনিবার্য।

ফাঁসি ! ফাঁসি ! ফাঁসি !

সুজিত যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ফাঁসির দড়িটা ঝুলছে। একটা বিষাক্ত সাপের মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে আছে দড়িটা। তারপর, তারপর সাপটা সুযোগ বুঝে ছোবল দেবে সুজিতকে।

এ নিশ্চয়ই মমির চক্রান্ত। মমিই খুন করে গেছে আব্দুলকে। কিন্তু কেন খুন করলো মমি ?

তার ঘরে কাল রাতে আব্দুল ঢুকেছিলো কেন ? মমির সঙ্গে আব্দুলের কি সম্পর্ক ?

আচ্ছা, সুজিত সব বলে দেবে পুলিশকে !

ঘটনার সব আনুপূর্বিক ইতিহাস সে জানিয়ে দেবে নাকি ?

কিন্তু না, অন্তত আজকের রাতটি পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকবে সুজিত। আজই তো তার দেখা হবে মিঃ রিচার্ডসনের সঙ্গে। তাকে সে সব কথা খুলে বলবে।

মিঃ রিচার্ডসন থাকতে ভয় কি তার ?

সুজিত কোনো রকমে দুটো খেয়ে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তার গন্তব্যস্থল পিরামিড।



॥ দশ ॥

অন্ধগুহার বন্দী

সেই অন্ধকার ঘরে রিচার্ডসন ও খলিলের কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে। কয়েকটি ঘণ্টা তো নয় যেন কয়েকটি যুগ।

কিন্তু সেই ঘর থেকে বার হবার কোনো আশাই দেখছেন না মিঃ রিচার্ডসন।

খলিল যেন আরও ভেঙে পড়েছে। অতো বড়ো দেহটা নির্জীব হয়ে পড়েছে। খলিল কোনো কথা বলছে না। গোঙাচ্ছে।

gaiporchhabi.blogspot.com

মিঃ রিচার্ডসন বললেন, কথা বলছো না কেন, খলিল ? এতো সহজে মুষড়ে পড়লে এ সব কাজের ভার হাতে নেওয়া যায় না। এ কাজে প্রতি মুহূর্তে যে বিপদ আছে এটা জেনেই তো তুমি কাজে হাত দিয়েছো।

ধমক খেয়ে খলিল চুপ করে গেলো।

হঠাৎ শোনা গেলো, পায়ের শব্দ। একটি পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। রিচার্ডসন ইশারা করলেন, চুপ। খলিল চুপ করে গেলো।

পায়ের শব্দটা মিলিয়ে গেলো।

বেশ খিদে পেয়েছে রিচার্ডসনের। পেট চোঁ চোঁ করছে। বেলা এখন কতো হবে ? বন্দীদশার প্রায় পাঁচ-ছয় ঘণ্টা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

মিঃ রিচার্ডসন ডাকলেন, খলিল।

—ইয়েস স্যর।

—তুমি এক কাজ করো। আমাকে কাঁধে করে তুলে ধরতে পারবে ?

—পারবো স্যর।

—বেশ তাহলে চেষ্টা করো। আমি ঘুলঘুলির জানলাটার নাগাল পাই কিনা, দেখি।

খলিল রিচার্ডসনকে কাঁধে করে ওপরে তুললো। কয়েকবার তিনি চেষ্টা করলেন, ঘুলঘুলির জানলায় হাত পাওয়া যায় কিনা।

কিন্তু না, পাওয়া গেলো না। মুক্তির কোনো আশাই নেই। দেওয়ালটাও মসৃণ। পা রাখবার কোনো জায়গা নেই।

হতাশ হয়ে বসে পড়লেন রিচার্ডসন। খলিল তখন বসে বসে হাঁফাচ্ছে।

একটু পরে খলিল লাফ দিয়ে উঠলো, সাপ। সাপ।

রিচার্ডসনও চমকে উঠেছিলেন।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললেন, কোথায় সাপ ?

—ঐ যে স্যর সামনে। আমার হাত ঠেকে গিয়েছিলো। কী ঠাণ্ডা।

রিচার্ডসন এগিয়ে এসে বললেন, কই ? কোথায় ?

খলিল সামনে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো।

অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছে না। একটা কালো মতো লম্বা জিনিস মাটিতে পড়ে রয়েছে। দেখতে সাপের মতোই বটে।

এই তো স্যর। সরে আসুন স্যর। শয়তানটা হয়তো এখনই ছোবল দেবে।

রিচার্ডসন সে কথা শুনলেন না। এগিয়ে গিয়ে সেই লম্বা হিমশীতল বস্তুটির গায়ে মারলেন বুটের এক লাথি। ঠং করে একটা শব্দ হলো। আরে কোথায় সাপ। এ যে দেখছি একটা শাবল।

—শাবল ?

—হ্যাঁ। এই দেখো, এই একটা কোদাল পড়ে রয়েছে। মনে হয়, এই ঘরটায় ঘর-বাড়ি মেরামতের অব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ফেলে রাখা হতো। ভগবান আছেন খলিল।

রিচার্ডসন শাবলটা হাতে তুলে নিলেন। তারপর দেওয়ালে ঘা দিতে লাগলেন। মনে হলো, দেওয়ালগুলি ফাঁকা। কারণ শাবলের আঘাতে গমগম করে উঠলো সারা ঘর। দেওয়ালগুলি কেঁপে উঠতে

লাগলো। ঠিক এমন সময় দরজার সামনে শোনা গেলো আবার পায়ের শব্দ।

সেই পুরোনো পায়ের শব্দ আবার এগিয়ে আসছে। শব্দটা এগিয়ে এলো কাছে। আরও কাছে। তারপর দরজায় চাবি খোলার শব্দ হলো।

রিচার্ডসন দেওয়াল খোঁড়া বন্ধ করেছেন। খলিল কি একটা বলতে যাচ্ছিলো। রিচার্ডসন তাকে ইশারা করে থামিয়ে দিলেন।

ওরা দু'জনে অন্ধকারে দেওয়ালের গা ঘেঁসে দাঁড়ালেন। একটি লোক দরজা খুললো, হাতে তার টর্চ। আর এক হাতে বর্শা।

এক সেকেণ্ড। দু' সেকেণ্ড।

টর্চের আলো এসে পড়লো রিচার্ডসনের মুখে।

রিচার্ডসন চোখের নিমেষে মাথা নিচু করলেন। অমনি বিদ্যুৎ-গতিতে বর্শাটা এসে বিঁধলো পিছনের দেওয়ালে।

রিচার্ডসন এবার ছুটে গেলেন। হাতের শাবলটি দিয়ে আঘাত করলেন টর্চটির উপর। সেটি পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো।

অন্ধকার। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে লোকটি পালাতে চেষ্টা করছিলো। রিচার্ডসন লোকটির দিকে দৌড়ে এগিয়ে গেলেন। লোকটি সেই অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে খোলা চাতালে পড়লো। তারপর কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো। যে জায়গাটায় ওঁরা এলেন, সেটি খোলা চাতাল। কিন্তু চার পাশে পুরোনো বাড়ির প্রাচীর। মনে হয়, কোনো বিরাট-ভগ্ন প্রাসাদের মাঝখানের অংশ এটা।

হয়তো প্রাসাদের সামনে রাস্তা আছে এবং অনুমান করা যায়, সামনেই সেই চণ্ডুর দোকান। যে দোকান দিয়ে রিচার্ডসন এ বাড়িতে ঢুকেছিলেন।

খোলা জায়গাটায় এসে রিচার্ডসন ও খলিল কি করবেন ভেবে পেলেন না। রিচার্ডসন শাবলটা ফেলে দিলেন। একটু এদিক ওদিক তাকাতেই দেখা গেলো, সামনে দিয়ে একটা নোংরা গলি চলে গেছে। ওঁরা সেই গলিটা ধরে এগোতে লাগলেন।

গলিটা গিয়ে একটি দোকান ঘরের পিছনে শেষ হয়েছে।

দোকানটির পিছনের দরজা খোলা ছিলো। ওঁরা এসে ঢুকলেন সেই পিছনের দরজা দিয়ে। যে দোকানে ওঁরা গেলেন সেটি একটি ভাঁটিখানা। পিছন দিকটাতে সারি সারি পিপে দাঁড় করানো আছে। পিপে বোঝাই মদ। ভিতর থেকে ভ্যাপ্সা গন্ধ বেরোচ্ছে।

রিচার্ডসন খলিলকে বললেন, এসো, এই পিপের আড়ালে কিছুক্ষণ লুকিয়ে থাকা যাক।

মদের উগ্রগন্ধে বমি ঠেলে আসার যোগাড়।

শোনা গেলো পায়ের শব্দ। কে যেন এগিয়ে আসছে।

আর বুঝি রক্ষা নেই। এবার ধরা পড়তেই হলো। একটি লোক এগিয়ে আসছিলো, বোধহয় ভাঁটিখানার কর্মচারী।

সে এসে দাঁড়ালো একটি পিপের সামনে। যার পিছনে রিচার্ডসন লুকিয়ে ছিলেন।

লোকটি একেবারে সামনা-সামনি পড়ে গেলো।

রিচার্ডসনকে দেখে লোকটি হঠাৎ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো।

তারপর চিৎকার করে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে রিচার্ডসন করলেন কি—পিপেটা উল্টে দিলেন তার উপর। আর একটা পিপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো খলিল।

লোকটি আচমকা বাধা পেয়ে চিৎকার আরও বাড়িয়ে দিলো। আরবি ভাষায় প্রাণপণ চিৎকার করতে লাগলো লোকটি। যার মানে বোঝায়, বাবারে মারে, মরে গেলুম রে।

রিচার্ডসন খলিলকে অনুসরণ করতে বলে এক লাফে এসে হাজির হলেন একেবারে ভাঁটিখানার ভেতর। সেখানে একদল মাতাল জটলা করছিলো। রিচার্ডসন খলিলকে ইঙ্গিত করে কি দেখালেন। তারপর দেখা গেলো, মিঃ রিচার্ডসন আর খলিল দু'জনেই দুটো গেলাশ নিয়ে মাতালদের সঙ্গে মিশে মাতলামি করতে লেগে গেছেন।

যে লোকটি পিপের কাছে গিয়েছিলো, সে দোকানের মালিক। পিপে থেকে সে কিছু মদ ঢেলে আনতে গিয়েছিলো।

কিন্তু মাতালরা নেশায় এমনই চুর হয়েছিলো যে কেউ তার সে চিৎকার শুনছিলো না।

একজন মাতাল আর একজনকে বললো, পিপের ভেতরে একটা দানো দারুণ চেঁচাচ্ছে।

সে-মাতালটি বললো, দূর, যেটা চেঁচাচ্ছে ওটা একটা ইঁদুর। বোধহয় জাঁতি কলে পড়েছে।

প্রথম মাতাল বললো, কখ্খনো না। আমি বলছি দানো।

দ্বিতীয় মাতাল বললো, আমি বলছি, ইঁদুর।

এই নিয়ে দু'জনে ঘুঁষোঘুঁষি শুরু হয়ে গেলো। একটু পরেই দেখা গেলো, মাতালদের মধ্যে দুটো দল হয়ে গেছে এবং দু'দলে দারুণ মারামারি লেগে গেছে। দু'-চারটে ঘুঁষি রিচার্ডসনের ওপরেও এসে পড়লো।

রিচার্ডসন বললেন, খলিল এই সুযোগ। চলো, পালানো যাক।

রিচার্ডসন আর খলিল চুপি চুপি ভাঁটিখানা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সামনে দিয়ে সরু গলি ধরে হাঁটতে আরম্ভ করলেন ওঁরা। দু'পাশে বাড়ি, দোকান পাট, গুদাম ঘর।

অনেকক্ষণ ধরে হাঁটার পর ওঁরা বড়ো রাস্তায় পড়লেন। তারপর রাস্তা থেকে দুটো ঘোড়া ভাড়া করে নিয়ে, তাতেই দু'জনে উঠে বসলেন।

তখন বিকেল হয়ে গেছে। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। রিচার্ডসন একটি রেষ্টুরেণ্টে ঢুকলেন!

পকেটে সামান্য পয়সা ছিলো। রেষ্টুরেণ্টটিও ছোটো। সামান্য কিছু খাবারের অর্ডার করলেন রিচার্ডসন। তারপর ফিস ফিস করে খলিলকে বললেন, ক'টা বাজে?

—পাঁচটা।

—আর দু'ঘণ্টা সময় আমাদের হাতে। এই দু'ঘণ্টার মধ্যে আমাদের যা কিছু হোক করে যেতে হবে। আমরা এখান থেকে পিরামিডের বাস ধরবো। এখন নয়, ঠিক সন্ধ্যার একটু পরে।

—তারপর?

—তারপর আজকের নাটকের উপর যবনিকা পড়বে। এখন যে করেই হোক আমাদের পিরামিড পৌঁছোতে হবে।



।। এগারো ।।

পিরামিডের আতঙ্ক

পিরামিড।

প্রায় চার হাজার বছর আগে মিশরের ফারাওরা এই পিরামিড তৈরি করেছিলেন।

মিশরের সম্রাটদের তখন বলা হতো ফারাও। ফারাওরা রাজ-পরিবারের কেউ মারা গেলে কবর দিতেন না। মমি করে মৃতদেহ সংরক্ষণ করতেন। এক-একটা পিরামিডের ভেতর মমিদের রাখতো।

পাথর দিয়ে তৈরি ত্রিভুজ পর্বত পিরামিড।

এই পিরামিডগুলির এক-একটি সাতশো পঞ্চান্ন থেকে সাতশো ছাপান্ন ফিটের মতো ব্যাস আর চারশো একাশি ফিট উঁচু। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো গীর্জা সেন্টপিটার চার্চ পর্যন্ত এর মধ্যে ঢুকে যেতে পারে।

সুজিত এই পিরামিডের কাছে এসে দাঁড়ালো। এতোদিন সে শুধু পিরামিডের ছবিই দেখেছে। এবার সেই পিরামিডের সামনা-সামনি এসে দাঁড়ালো সে। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি। এই অদ্ভুত পিরামিড।

চার হাজার বছর ধরে নিশ্চল পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

সুজিত পিরামিডের ষ্টপেজে বাস থেকে নামতেই ওর দিকে একদল লোক এগিয়ে এলো।

—উট চাই স্যর?

—টাট্টু চাই স্যর?

উটওয়ালা বললো, বেদুইনের পোশাক পরে ছবি তুলুন স্যর। গুড ক্যামেল। উটে চড়ে পিরামিড দেখুন।

সুজিত একটা উট ভাড়া করলো। উটওয়ালার নাম হোসেন। হোসেন আবার গাইডও। সে সুজিতকে পিরামিডের ইতিহাস শোনাবে বললো।

অনেকগুলি পিরামিড পর পর। তার পাশে পাশে ফিঙ্কসের প্রতিমূর্তি, বালুকাময় প্রান্তর। মরুভূমির ইশারা।

হোসেন সুজিতকে একটি পিরামিডের সামনে নিয়ে এলো। বললো, এই যে দেখছো পিরামিড, এটির বয়স তিন হাজার বছর। খণ্ড খণ্ড চূণা পাথর একসঙ্গে করে এই বিরাট পর্বত তৈরি হয়েছে। প্রায় দু' লক্ষ পাথর সাজিয়ে তৈরি। আর এক একটা পাথরের ওজন কতো জানো, প্রায় পনেরো টন করে।

পিরামিড সব সময়ই নদীর কাছাকাছি হবে। কারণ নদীতে নৌকো বোঝাই করে এই সব পাথর নিয়ে আসা হতো।

হোসেন সুজিতকে বললো, নামো। তাড়াতাড়ি চলো তোমাকে পিরামিড দেখিয়ে নিয়ে আসি। নয়তো বন্ধ হয়ে যাবে।

পিরামিডের এক পাশ দিয়ে সিঁড়ির মতো খাঁজ কাটা। বেশ কষ্ট করেই উঠতে হলো। কিছু দূর ওঠার পর ওরা এসে পৌঁছালো এক গুহার মুখে।

হোসেন বললো, এবার হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে।

হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখা গেলো, সিঁড়ি চলে গেছে পিরামিডের মাথার দিকে। আরও অনেক ট্যুরিষ্ট চলেছে ওপরের দিকে। সুজিতও চলতে লাগলো।

অনেকক্ষণ চলার পর সুজিত এসে পৌঁছোলো পিরামিডের ঠিক ওপরে। একটা বড়ো হলঘরের মতো জায়গা। সারি সারি মমি শোওয়ানো আছে। এখন আর তাদের হাড়গোড়ের পর্যন্ত অস্তিত্ব নেই। তিন হাজার বছর ধরে এভাবে থেকে তারা আজ পরিণত হয়েছে ফসিলে।

হোসেন বললো, আমরা প্রায় চারশো ফিট ওপরে উঠলাম

এই পিরামিড তৈরি করতে বিশ বছর সময় লেগেছিলো। এক লক্ষ লোককে এটি তৈরির কাজে লাগানো হয়। ফারাওরা যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে যে সব ক্রীতদাস ধরে আনতেন তাদের লাগানো হতো পিরামিড তৈরির কাজে।

সুজিত বললো, আচ্ছা, শুনেছি, পিরামিডের ভেতর মমিদের সঙ্গে নাকি প্রচুর সোনাদানা ধন দৌলতও রেখে দেওয়া হতো?

হোসেন বললো, হ্যাঁ, হাজার হাজার বছর ধরে এক-একটা পিরামিড ছিলো এক-একটা রত্নখনি। শুধু ঘড়া ঘড়া সোনা-দানা নয়, কোনো ফারাও মারা গেলে তার যতো কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, এমন কি অস্ত্রশস্ত্র পর্যন্ত রেখে দেওয়া হতো পিরামিডের ভিতর। কারণ, প্রাচীন মিশরীরা মনে করতো, মমিরা একদিন জেগে উঠবে এবং তাদের যা কিছু জিনিসপত্র সবই একদিন আবার ব্যবহার করবে। প্রতিদিন পুরোহিতরা এসে মমিদের জন্য খাবার আর পানীয় রেখে যেতেন। মৃত আত্মাদের জাগানোর জন্য মন্ত্র পাঠ করা হতো।

কথা বলতে বলতে পিরামিডের সেই কক্ষ কখন নির্জন হয়ে এসেছিলো! সুজিত সভয়ে দেখলো পিরামিডের ভেতরে দাঁড়িয়ে একমাত্র সে আর হোসেন।

এ যেন মৃতের পুরী। এখানে বেশিক্ষণ থাকলে দম-বন্ধ হয়ে আসে। মনে হয়, হাজার হাজার বছরের ঘুম ভেঙে ফারাওদের আত্মারা এখনই জেগে উঠবে।

আর জেগে উঠেই কৈফিয়ৎ দাবি করবে এ যুগের সভ্য মানুষের কাছে।

আমাদের জাগালে কেন?

কেন আমাদের ঘুম থেকে তুললে? বেশ তো নিশ্চিন্তে আমরা হাজার হাজার বছর এখানে কাটিয়ে দিচ্ছিলাম। তোমরাই এসে সে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটালে।

নাও তার শাস্তি।

চমকে উঠলো সুজিত।

হাঃ হাঃ হাঃ।

কে যেন হেসে উঠলো। সারা পিরামিডের ভিতরে প্রতিধ্বনি শোনা গেলো, হাঃ হাঃ হাঃ।

ওঃ কী বীভৎস সেই অট্টহাসি!

হাসছে হোসেন।

—তুমি হঠাৎ চমকে উঠলে বলে আমি হাসছি। কিছু মনে করো না। হাসতে হাসতেই সুজিতকে বললো হোসেন।

—তুমি হাসছো। আমি ভাবছি, কে-না কে! সুজিত বললো।

—ভাবছো, মমিরা কফিন থেকে উঠে এলো নাকি! তাও যে হয় না, তা বলি কি করে। এই তো আজ থেকে এক বছর আগে একদল বিদেশী এসেছিলো পিরামিড দেখতে। তারা এসেছিলো জার্মানি থেকে। একদল নওজওয়ান। তার মধ্যে একটি ছেলে ছিলো খুব ডাকসাইটে ডানপিটে। সব কিছুতে তার অবিশ্বাস।

আমি তাদের নিয়ে এসেছিলাম এই পিরামিডের ভেতর। কথায় কথায় বললাম, এখনও প্রতি অমাবস্যার রাতে মমিরা নাকি প্রাণ ফিরে পায়। গভীর রাতে পিরামিড যখন নিঝুম হয়ে যায়, সে সময় তারা বেরিয়ে আসে বাইরে। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে বালির ওপর ঘুরে বেড়ায়।

আমার কথা সে ছেলেটি বিশ্বাস করলো না।

সে বললো, হতে পারে না। প্রমাণ দিতে পারো?

আমি বললাম, প্রমাণ আমি নিজের চোখে দেখেছি। পরদিন সকালে বালির ওপর অসংখ্য পায়ের দাগ।

ছেলেটি বললো, পায়ের দাগ যে কোনো লোকের হতে পারে। হাজার হাজার বছরের মৃত আত্মা কখনও প্রাণ ফিরে পেতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি না। এই দেখো, তোমার সামনে এই মমির গায়ে আমি লাথি মারছি। যদি মমির প্রাণ থাকে তাহলে সে আমার ক্ষতি করুক। আমরা সকলে চমকে উঠলাম। ওর দলের ছেলেরাও ওকে ছি-ছি করতে লাগলো। ওদের ভ্রমণের আনন্দটাই যেন মাটি হয়ে গেলো।

এরপর হাসি ঠাট্টা হৈ-চৈ আর জমলো না। আমরা পিরামিড থেকে নামতে লাগলাম।

আমি আগে। তারপরে কয়েকটি ছেলে। মাঝখানে সেই দুঃসাহসিক ছেলেটি। পিছনে গোটা দল। সবসুদ্ধ জন দশেক হবে।

হঠাৎ শুনলাম, ধুপ করে কি পড়লো মাটিতে। তারপরেই ছেলেদের চিৎকার। সেই দুঃসাহসিক ছেলেটি পড়ে গেছে চারশো ফুট নিচে। সঙ্গে সঙ্গে নিচে যাওয়া হলো। ঘাড় মটকে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে তার।

ওর পেছনে যারা আসছিলো তারা সবাই বললো, ওকে কে যেন ঠেলা মেরে ফেলে দিলো। তা না হলে ওভাবে কেউ পড়ে যেতে পারে না।

আমি জানি, ওকে কে ফেলেছে। ওকে ফেলেছিলো সেই অপমানিত আত্মা। এই সেই মমি। যে মমির গায়ে ও লাথি মেরেছিলো। আর যে মমি তার জীবন নিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছিলো।

সুজিত চমকে উঠলো।

কেবিনটা ভাঙা। ধূলি-ধূসর ন্যাকড়ায় জড়ানো এক ফসিল মরদেহ। কী বীভৎস দেখতে লাগছে।

সুজিত আর তাকাতে পারছে না। হোসেনকে সে বললো, ফেরা যাক।

হোসেন বললো, এবার আসল কথাটা এই বেলা বলে ফেলি, মিঃ রয়।

—রয়! আমার নাম জানলে কি করে?

—জানি। হোসেন তার আলখাল্লার পকেট থেকে একটা আইডেনটিটি কার্ড দেখালো। আমি ইন্টারপোলের লোক। মিঃ রিচার্ডসন আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি আজ আসতে পারলেন না। ঘোড়ার গাড়ির ষ্ট্যাণ্ডের কাছে তোমার জন্য আমিই অপেক্ষা করছিলাম। তবে এ ছদ্মবেশ সতর্কতার জন্য। চারিদিকে মমির লোক ওৎ পেতে আছে।

তুমি আমায় লাইটার আর চাবির রিংটি দিয়ে দাও, মিঃ রয়। এটা দিয়ে তুমি দায়িত্বমুক্ত হয়ে নাও।

সুজিতের অবাকের উপর আরও অবাক হবার পালা। হোসেনই তাহলে সেই ইন্টারপোলের লোক। কিন্তু রিচার্ডসনের সঙ্গে দেখা হলো না কেন?

হোসেন বললো, উনি পালিয়ে আছেন। ওঁর পক্ষে কোথাও বার হওয়া এখন নিরাপদ নয়।

সুজিত তার হাত-ব্যাগ খুলে লাইটারটিতে যেমন হাত দিয়েছে অমনি শোঁ করে একটা আধলা ইঁটের মতো পাথর হোসেনের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। হোসেনও পকেট থেকে একটা রিভলবার বার করে গুলি ছুঁড়লো।

গুড়ুম। গুড়ুম।

প্রতিধ্বনি হলো পিরামিডের মধ্যে।

হোসেন তাড়াতাড়ি বললো, মিঃ রয়, মমি জানতে পেরেছে আমাদের গোপন কথা। তুমি শীগ্‌গির লাইটার আর চাবির রিংটা আমায় দিয়ে দাও।

সুজিত তাড়াতাড়ি সেটি বার করে দিলো। সেটি পাওয়ামাত্র হোসেন কোথা দিয়ে যেন অদৃশ্য হয়ে গেলো।

হোসেন। হোসেন।

কোনো সাড়া শব্দ নেই। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। পিরামিডের ভেতর থেকে বার বার পথটা সুজিত হারিয়ে ফেলছে।

এমন সময় সেই গুহার মধ্যে ঢুকলো খলিল আর রিচার্ডসন।

—রয়, রয়।

—মিঃ রিচার্ডসন! কোথায় ছিলেন আপনি? আপনার সহকারীর হাতে আমি ওগুলো দিয়ে দিয়েছি।

রিচার্ডসন যেন কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

—ওঃ কী হলো আমার! রয়, ও আমার সহকারী নয়। ও হচ্ছে মমির লোক। কি বিরাট ধাপ্পা দিয়ে জিনিসটি মমি নিয়ে গেলো। তীরে এসে তরী ডোবালাম।

—আপনার লোক নয় ?

—না। মমির এক অত্যাশ্চর্য অভিনয়। সব তোমাকে বলবো। সে অনেক কথা। আমাদের মমি বন্দী করে রেখেছিলো। আমার লেখা একটা চিঠি ওদের হাতে গিয়ে পড়ে। তখনই বুঝতে পারি যে মমি তোমাকে হয়তো বিভ্রান্ত করবে। বন্দী-দশা থেকে কোনোরকমে নিজেদের মুক্ত করে এখানে ছুটে আসছি। কিন্তু এসেও শেষ-রক্ষা করতে পারলাম না।

কিন্তু চলো, আমরা এই মুহূর্তে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। মিঃ রিচার্ডসন আগে আগে চললেন। পিছনে পিছনে খলিল ও সুজিত।

দুর্ভেদ্য অন্ধকার পিরামিডের সিঁড়িতে। কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর রিচার্ডসন বললেন, চুপ। সামনের দিক থেকে কারা যেন এগিয়ে আসছে। খলিল, তোমার রিভলবার বার করো।

সেই পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতে লাগলো।

কারা যেন, এগিয়ে আসছে। ভারি বুটের আওয়াজ। একজনের হাতে টর্চ। টর্চের আলো এসে পড়লো তাদের ওপর।

গুড়ুম।

মিঃ রিচার্ডসন গুলি করলেন। অব্যর্থ লক্ষ্য। টর্চের কাঁচ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। লোকটির দেহ ভেদ করে গুলি চলে গেছে।

একটা আর্তনাদ উঠলো, আঃ—আ—আ।

আবার অন্ধকার। ওপাশ থেকে গুলি ছুটে এলো।

গুড়ুম। গুড়ুম।

—শুয়ে পড়ো। শুয়ে পড়ো। মিঃ রিচার্ডসন বললেন।

সুজিত আর খলিল শুয়ে পড়লো। একটার পর একটা গুলি চলে যাচ্ছে তাদের মাথার ওপর দিয়ে। মনে হচ্ছে, বুঝি মহাপ্রলয় আসন্ন। পিরামিডের গহ্বরে হাজার বছরের মৃত মমিরা জেগে উঠেছে।

রিচার্ডসন বললেন, মমি তার দলবল নিয়ে আক্রমণ শুরু করে

দিয়েছে। তোমরা আমার সঙ্গে পিছনে হটো। চলো আবার পিরামিডের ভেতরে আমরা আশ্রয় নিই।

অন্ধকারে ওরা হামাগুড়ি দিয়ে পিছনে হটতে শুরু করলো।

হাঁটু ছড়ে গেছে। অসম্ভব জ্বালা করছে। সুজিত তবু পাগলের মতো অনুসরণ করছে রিচার্ডসনকে। ওরা আবার এসে পৌঁছোলো পিরামিডের মুখে।

অন্ধকার।

রিচার্ডসন বললেন, তোমরা যে যেখানে পারো নিরাপদে আশ্রয় নাও। মমির দল এখানে ধাওয়া করবে।

কিন্তু কোথায় নিরাপদ জায়গা।

অন্ধকারে কি একটা বেঁধে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো সুজিত। হাত বুলিয়ে দেখে শিউরে উঠলো। একটা শক্ত কাঠ। একটা মমির দেহ।

হঠাৎ রিচার্ডসন বললেন, এদিকে এসো। এদিকে।

পিরামিডের দেওয়ালের একদিকে একটা প্রকাণ্ড পাথর। সুজিত ও খলিল সেদিকে এগিয়ে যেতেই রিচার্ডসন বললেন, আমার মনে হচ্ছে, এখানে কোনো গুপ্ত পথ আছে। ফারাওদের লোকজন বিশেষ করে পুরোহিতরা যাতে পিরামিডের ভেতর ঢুকতে পারেন তার জন্য পিরামিডে একটা করে গুপ্ত-পথ থাকতো। এই বোধহয় সেই গুপ্ত পথ।

তিনজনে প্রচণ্ড শক্তি নিয়োগ করলো পাথরটাকে সরাবার জন্য। দরদর করে ঘাম পড়ছে।

এইবার শিথিল হলো এক গহ্বর। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনো অতিকায় জন্তু যেন হাঁ করে গিলতে আসছে।

রিচার্ডসন বললেন, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তোমরা আমাকে অনুসরণ করো।

তারপর তিনটি মানুষ সেই অন্ধকারের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেলো।

কী ভ্যাপসা গন্ধ। কতোদিন পরে এই সুড়ঙ্গ-পথে মানুষ যাচ্ছে। হয়তো কতো হাজার বছর ব্যবহৃত হয় না এ সুড়ঙ্গ-পথ।

সুজিতের যেন বমি ঠেলে আসতে লাগলো। তার মাথাটাও বন বন করে ঘুরছে। আর কতো দূরে?

—রিচার্ডসন এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর যেন চলার ক্লান্তি নেই। বিরাম নেই।

কিন্তু সুজিত যে আর পারছে না। ঝিম ঝিম করছে মাথা। পা ভারি হয়ে আসছে।

আমি আর পারছি না, মিঃ রিচার্ডসন।

সুজিতের ক্লান্ত কণ্ঠস্বরে রিচার্ডসন একবার পিছন ফিরে তাকালেন। খলিলকে বললেন, খলিল তুমি রয়কে ভালো করে ধরো। রয়, তুমি খলিলের হাত ধরো। আর বেশি দেরি নেই। আমরা এসে পড়লাম বলে।

আর মিনিট পাঁচেক চলার পর আকাশ দেখা গেলো। ঝির ঝির করে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে ভেতরে।

কিন্তু গুহার মুখে এক প্রকাণ্ড পাথর। সেই পাথরের ফাঁক দিয়ে যেটুকু হাওয়া আসার আসছে।

রিচার্ডসন গিয়ে সেই পাথরটাকে নাড়াতে লাগলেন। রয়, খলিল, তোমরা হাত লাগাও।

হেঁইয়ো মারে হেঁইয়ো। হেঁইয়ো—

বহু কষ্টে সরে গেলো পাথরটা।

মুক্তি—মুক্তি।

অন্ধকারের রাজ্য থেকে বাইরে এসে যেন ওঁরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। চারিদিকে খোলা আকাশ। খুব তৃপ্তি পেলেন ওঁরা। আকাশে তারারা জ্বলছে ঝিকিমিকি। যে জায়গাটায় ওঁরা এসে পড়লেন, সে জায়গাটা একটা মরূদ্যানের মতো। কিছু খেজুর গাছ। বালি। আর একটা প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ।

মনে হয়, আগে এখানে কোনো প্রাসাদ ছিলো। তারপর কালক্রমে মরুভূমি সেটি গ্রাস করে নিয়েছে।

রিচার্ডসন সুজিতকে বললেন, আর একটু এগিয়ে গেলেই পিচের

রাস্তা। সেটি ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে গেলে কায়রো যাবার বাস পাবে। খুব সাবধানে যাবে। গুড বাই।

সুজিত বললো, সে কী, আপনি? আপনি যাবেন না?

আমরা মমির সন্ধানে চললাম। আর হয়তো জীবনে দেখা হবে না। বিদায়।

রিচার্ডসনের কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি—অমনি হুইশেলের শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে একদল সশস্ত্র পুলিশ এসে ঢুকলো ওদের সামনে। পুলিশ দলের সামনে ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়িওয়ালা সেই ভদ্রলোক। যাকে সে আমেরিকান এক্সপ্রেসে যাবার পথে প্রথম দেখেছিলো।

শুধু সেদিন নয়। আজও লোকটিকে দেখেছে সুজিত।

সুজিতের পিছন পিছন ধাওয়া করেছিলো লোকটি।

—হাত তোলো, মমি।

মমি? সুজিত অবাক হয়ে ফিরে তাকালো।

রিচার্ডসন হাত ওপরে তুলেছেন। দেখাদেখি খলিলও।

চোখের নিমেষে কি যে ঘটলো সুজিত তা বুঝতে পারলো না। কারা এরা? পুলিশের পোশাক। প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। এরা কোথাকার পুলিশ? এরা কি জানে না, রিচার্ডসন ইন্টার-পোলেরই লোক।

—আমাদের এ ভাবে ডিস্টার্ব করছো কেন? কি চাও তোমরা? রিচার্ডসন হাত-তোলা অবস্থাতেই জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন।

—তোমার এবারের চাল কিন্তু খুব সহজ ও সরল। কিন্তু দুঃখের বিষয় শেষ রক্ষা করতে পারলে না।

—কী ব্যাপার?

—এই তো ব্যাপার। মমি, এটা চিনতে পারো?

—লোকটি পকেট থেকে একটি ক্ষুদ্রকায় বস্তু বার করে হাতের আঙুলে ধরলো।

—এটা চিনতে পারো?

সুজিত সভয়ে বললো, এই তো সেই লাইটার।

লোকটি বললো, এটি শুধুমাত্র একটি লাইটার নয়। এর মধ্যে আছে পৃথিবীর দুর্লভতম হীরা কোহিনূর। এই সামান্য একটা জিনিসের সন্ধানে সারা পৃথিবী ঘুরছি। আর মিঃ রিচার্ডসন নামধারী লোকটি আর কেউ নয়—মমি স্বয়ং।

মমি, শেষ পর্যন্ত তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী দল লাইটারটা ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। আমরা এটি ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি ওই দলের কাছ থেকে। তাদের মৃতদেহ একটু দূরে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

লোকটি তারপর সুজিতের দিকে তাকিয়ে বললো, মিঃ রয়, কুখ্যাত আন্তর্জাতিক চোরাই চালানকারী মমির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার অপরাধে আমরা আপনাকেও গ্রেফতার করলাম।

সুজিত বললো, কিন্তু জানতে পারি কি কে আপনি ?

লোকটি বললো, আমি ইণ্টারপোলের অফিসার ম্যাথুস। এরা কায়রো পুলিশ।

সুজিত বিশ্বাস করতে পারছিলো না। চোখের সামনে যেন সিনেমার রোমাঞ্চকর দৃশ্যগুলির অভিনয় হয়ে যাচ্ছে। মিঃ রিচার্ডসনই মমি ? আর ঐ লাইটার ? যেটি মিঃ রিচার্ডসনের স্মৃতিচিহ্ন ? সেটি, সেটি এক দুর্লভ হীরা ? তাহলে এই দুর্লভ হীরা সে নিজের কাছে এতোদিন রেখে দিয়েছিলো ?

সুজিত বললো, আরে ঐ লাইটারটি তো আমার কাছেই ছিলো।

—আপনার কাছে ? মিঃ ম্যাথুস প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ। মিঃ রিচার্ডসন আমার কাছে রাখতে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তাঁর স্ত্রীর স্মৃতিচিহ্ন। এই দুর্লভ বস্তুটি যেন আমি তাঁর স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিই। আজ এই লাইটারটি ওঁর একজন প্রতিনিধির হাতে দেবার জন্য আমি এখানে এসেছিলাম।

ম্যাথুস বললেন, ঠিক আছে। সমস্ত রহস্যের উদ্ধার পরে হবে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে প্রয়োজনের খাতিরে আপনাকে গ্রেফতার করতে হচ্ছে। কারণ আপনার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগও

আছে। মেট্রোপোল হোটেলের ওয়েটার আব্দুলকে আপনি খুন করেছেন।

সুজিত তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করে উঠলো, না, না, এ হতে পারে না। এ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। আমি খুনী? না—না—মিঃ রিচার্ডসন, কথা বলছেন না কেন, বলুন, আমি খুনী?

মিঃ রিচার্ডসন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর দু'টি হাত ধরে দু'জন পুলিশ অফিসার। গোটা তিনেক রাইফেলের নল তাঁর দিকে ফেরানো।

হঠাৎ চক্ষের নিমেষে কি ঘটে গেলো। মিঃ রিচার্ডসন চেঁচিয়ে উঠে বললেন, ওকে তোমরা ছেড়ে দাও। ওর কোনো দোষ নেই। আমি খুনী। আব্দুলকে আমিই খুন করেছি। কিন্তু ম্যাথুস, সারা পৃথিবী তুমি আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছো, কিন্তু এতোদিন আমাকে ধরতে পারোনি। আজও কারোর সাধ্য নেই আমাকে ধরে।

মিঃ রিচার্ডসন এক ঝটকা দিলেন। ডানহাতটি সবলে মুক্ত করে নিলেন তিনি। তারপর পকেট থেকে একটি পিল বার করে চক্ষের নিমেষে মুখের ভেতরে পুরে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো পুলিশ কর্মচারীরা। মিঃ রিচার্ডসন ততোক্ষণে মাটিতে ঢলে পড়েছেন।

মিঃ ম্যাথুস তাড়াতাড়ি চিৎকার করে উঠলেন, শীগ্‌গির ওঁকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে জিপের ওপর তোলো।

মিঃ রিচার্ডসনকে নিয়ে জিপে তোলা হলো। তারপর জিপ ছুটে চললো কায়রো হাসপাতালের দিকে।

আর একটি জিপে মিঃ ম্যাথুস স্বয়ং সুজিতকে তুললেন। চালককে বললেন, চলো, হেডকোয়ার্টার।

জিপ ছুটে চললো।

যেতে যেতে মিঃ ম্যাথুস সুজিতকে বললেন, মিঃ রয়, আপনাকে বাঁচাতে পারি এক সর্তে। সমস্ত কথা আমাদের খুলে বলতে হবে। কোনো কিছু গোপন করা চলবে না। রিচার্ডসন নামধারী এই লোকটিরই আসল নাম মমি। আজ চোদ্দ বছর ধরে সে চোরাই

হীরের কারবার করছে। দুর্ধর্ষ প্রকৃতির এই লোকটির সঙ্গে আপনার কি করে পরিচয় হলো, আমাকে খুলে বলুন।

সুজিত বললো, বিশ্বাস করুন। রিচার্ডসনের সঙ্গে আমার আলাপ প্লেনে। আমাকে উনি বললেন, উনি ইন্টারপোলের পুলিশ অফিসার। মমির সন্ধানে এসেছেন। তারপর আমাকে ওই সিগারেটের লাইটার ও একটি চাবির রিং রাখতে দেন। বলেন, তাঁর জীবনের আশঙ্কা আছে। এই দু'টি জিনিস তাঁর একটা মস্ত বড়ো স্মৃতিচিহ্ন। আমি যেন এ দু'টি নিরাপদে রেখে দিই। তারপর তাঁর নির্দেশমতো তাঁর প্রেরিত লোকের কাছে পৌঁছে দিই।

—লাইটারটি নিয়ে আপনার কোনো সন্দেহ হয়নি ?

—না। তার কারণ আমি সিগারেট খাই না। নিজে কোনোদিন লাইটার ব্যবহার করিনি। লাইটারটি বাইরে থেকে দেখতে অতি সাধারণ বলে এটি নিয়ে আমি খুব উৎসাহ বোধ করিনি।

মিঃ ম্যাথুস বললেন, কি দুর্লভ বস্তু আপনি এতোদিন বহন করে এসেছেন, দেখুন। মিঃ ম্যাথুস পকেট থেকে লাইটারটি বার করলেন। তার পর লাইটারটি উল্টো করে ধরে সুজিতের দিকে দেখালেন, দেখুন, এর পেছনটাতে একটি ঢাকনি মতো আছে। টান দিলে খুলে যায়। এই দেখুন।

ম্যাথুস নিচের অংশটা ধরে টানতেই লাইটারটি দু'ভাগ হয়ে গেলো। দেখা গেলো, ভেতরে তুলো দিয়ে মোড়া এক হীরক খণ্ড। অন্ধকারে সেটি চক্ চক্ করে উঠছে।

এই হলো কোহিনূর। ইণ্ডিয়ার মোগল বাদশাদের কোহিনূর নয়। অষ্ট্রিয়ার মহারানী থেরেসা মোগল রাজপরিবারের কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে এটি সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর বহু হাত ঘুরতে ঘুরতে এটি আসে হলিউডের এক চিত্রতারকার কাছে। চিত্রতারকাটিকে খুন করে এক মার্কিন হীরক চালানকারী এটিকে রাজা ফারুকের কাছে দু'লক্ষ পাউণ্ডে বিক্রি করে দেয়।

রাজা ফারুক রাজ্যচ্যুত হলেন। বোধহয় এই হীরক ধারণের প্রত্যক্ষ ফল এটা। তিনি একবার বিপদে পড়ে এই হীরকটি প্রায়

জলের দামে বিক্রি করে দেন বৃটেনের এক হীরক ব্যবসায়ীর কাছে।

মমি এ ঘটনার কথা জানতে পারে। একদিন সে ঐ হীরক ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে এটি চুরি করে। চুরির ঘটনাটাও দারুণ চিত্তাকর্ষক। এ সম্পর্কে আমার ওপরওয়ালা একটি দীর্ঘ নোট তৈরি করেছেন। আমি সেই নোট থেকে যেটুকু জানতে পেরেছি সেটুকু আপনাকে বলছি।

হীরক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক কাগজে প্রাইভেট সেক্রেটারি চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। মমি সেই বিজ্ঞাপনের উত্তরে দরখাস্ত করে।

হীরক ব্যবসায়ী ধনী হলে কি হবে তিনি ছিলেন একটু কৃপণ প্রকৃতির। চাকুরি প্রার্থী হয়ে যতো লোক ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলো তাদের তিনি বলেন, কে কতো বেতন প্রত্যাশা করে, তা জানাতে। মমি এই দুর্বলতার সুযোগ নিলো। সে সবচেয়ে কম বেতন কবুল করে বসলো।

ভদ্রলোক তাকে চাকুরিতে বহাল করলেন।

প্রাইভেট সেক্রেটারি হলেও ব্যবসায়ী ভদ্রলোক তাঁকে ব্যবসায়ের গুহ্যতত্ত্ব কিছু বলেন নি। এমন কি কোহিনূর হীরেটা যে কোথায় কি অবস্থায় আছে তাও মমিকে জানতে দেননি।

মমি খোঁজ নিলো, যদি কোনো ভল্টে থাকে। না, কোনো ভল্টে ভদ্রলোকের অ্যাকাউন্ট নেই।

তাহলে নিশ্চয়ই এ বাড়িতেই কোথাও আছে সে হীরে। মমি গোপনে বাড়ির চাকর-বাকরদের কাছ থেকে জেনে নিলো কোথায় ভদ্রলোকের সিন্দুকের চাবি থাকে।

তারপর একদিন রাত্রি বেলায় চুপি চুপি মমি ভদ্রলোকের সিন্দুক খুলে ফেললো।

কোথায় সে কোহিনূর? শুধু টাকা ও কিছু সোনার গহনা পড়ে আছে। মমি হতাশায় ভেঙে পড়লো। প্রায় দু' মাস ধরে সে এই হীরার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু ভেঙে পড়লেও সে শুধু ক্ষণিকের জন্য।

মমি এরপর তার প্ল্যান ঠিক করে ফেললো।

একদিন রাত্তির বেলা সে বাড়িটায় আগুন ধরিয়ে দিলো। ব্যবসায়ী ভদ্রলোক তাঁর ঘরে বসে কাজ করছিলেন। মমি ছুটে এসে তাকে খবর দিলো—আগুন। আগুন।

অমনি ভদ্রলোকের চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠলো। তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। তারপর বইয়ের আলমারির ভেতর থেকে কি একটা নিয়ে জ্বলন্ত বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিরাপদ স্থানে এসে দাঁড়ালেন। মমি সমস্তই লক্ষ্য করছিলো।

আগুন অবশ্য তাড়াতাড়ি নিভিয়ে ফেলা হলো। বেশি ক্ষতি হতে পারেনি। কিন্তু মমির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেলো।

বিপদের সময় কোনটিকে আগে বাঁচাতে চেষ্টা করে মানুষ?

হয় খুব দামী কিছুকে। হয়তো প্রিয়তম কাউকে। ঐ ব্যবসায়ী সবার আগে বাঁচাতে চেয়েছিলেন হীরাটিকে।

কিন্তু দেখেন নি, একজোড়া শ্যেনচক্ষু তাঁকে লক্ষ্য করছে। সে চোখ মমির।

এরপর দেখা গেলো, মমি একদিন উধাও হয়ে গেছে বাড়ি থেকে।

হীরা ব্যবসায়ী তাড়াতাড়ি বইয়ের আলমারি ঘেঁটে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। কোহিনূর মণিও উধাও হয়েছে।

পুলিশে খবর গেলো। তারা ইণ্টারপোলে কেস রেফার করলো। প্রাইভেট সেক্রেটারির চেহারার যা বর্ণনা পাওয়া গেলো তা হুবহু মমির।

মমিকে সেই থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে পুলিশ। কিন্তু কিছুতেই তাকে ধরা ছোঁওয়া যাচ্ছে না। মমির চুলের রং কালো। বেশ স্বাস্থ্যবান লম্বা চওড়া চেহারা। গায়ের রং ফর্সা তবে একটু চাপা। তাকে য়ুরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের যে কোনো দেশের অধিবাসী হিসাবে চালিয়ে দেওয়া যায়।

কায়রোতে মমি এসেছে আমরা জানতে পেরেছিলাম। শুনেছিলাম, এখানে সে হীরেটা বিক্রি করতে এসেছে। কায়রো

হলো চোরাই হীরে বিক্রির আর একটি আড্ডা। আমরা যার কাছ থেকে এই হীরেটা উদ্ধার করি সে কায়রোর কুখ্যাত হীরক চোরাই চালানকারীদের একজন পাণ্ডা।

কিন্তু আমরা কিছুতেই ক'টি প্রশ্নকে পরস্পরের সঙ্গে মেলাতে পারছি না। এক হলো, আপনি কিভাবে ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন ?

দুই, আব্দুল কেন খুন হলো ? সে খুনের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি ? তিন, পিরামিডে আপনি আজ এসেছিলেন কেন ?

সুজিত এতোক্ষণ চুপ করে বসেছিলো। এবার বললো, আমার কথা তো আপনাকে বলেছি। এখন বিশ্বাস করা না করা আপনাদের ইচ্ছা।

মিঃ ম্যাথুস বললেন, কিন্তু আজকের রাতটা আপনাকে থানায় থাকতেই হবে, মিঃ রয়। মমি আত্মহত্যা করার পর এই কেসের যে প্রধান সাক্ষী তাকেই আমরা হারালাম। এখন আপনার ষ্টেটমেণ্টই আমাদের একমাত্র ভরসা। অতএব আপনাকে আর একটু কষ্ট করতেই হবে।

জিপ এসে পড়লো পুলিশ হেড কোয়ার্টারের সামনে।

সুজিতকে নিয়ে মিঃ ম্যাথুস নামলেন।

সুজিতকে চেয়ারে বসতে বলে ম্যাথুস টেলিফোন তুলে বললেন, একবার পুলিশ হাসপাতাল দাও তো।

—কে ? পুলিশ হাসপাতাল ?

—ইয়েস স্যর।

আমি ম্যাথুস বলছি। রিচার্ডসন নামে একটি পেশেণ্ট কিছুক্ষণ আগে ভর্তি হয়েছে। পয়জনিং কেস। কেমন আছে ?

—খুব ভালো না, স্যর।

—পেশেণ্ট যদি মারা যায়, যতো রাত্তিরই হোক আমার কাছে যেন খবর যায়।

—ইয়েস স্যর।

মিঃ ম্যাথুস টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

সুজিতের দিকে চেয়ে বললেন, তারপর ইয়ং ম্যান। আমার প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিন তো।

সুজিত বললো, বলুন।

—আব্দুলের সঙ্গে আপনার পরিচয় কতো দিনের ?

—কায়রো মেট্রোপোল হোটেলে তার সঙ্গে আমার আলাপ।

—এতো বেয়ারা থাকতে আব্দুলের সঙ্গে আপনার আলাপ হলো কেন ?

—তার কারণ আব্দুল আমাকে রোজ ব্রেকফাষ্ট দিয়ে যেতো।

—রিচার্ডসনের সঙ্গে কি আব্দুলের আগে থেকে আলাপ ছিলো ?

—আমার তো মনে হয় না।

—আব্দুলের সঙ্গে রিচার্ডসন সাহেবের কখনও গোপন কথাবার্তা লক্ষ্য করেছেন ?

—না। তবে আব্দুলকে একদিন রিচার্ডসন সাহেবের ঘরে আড়ি পাততে দেখেছিলাম।

—ঘরের মধ্যে কে কে ছিলো ?

—রিচার্ডসন সাহেব আর খলিল।

—তারা কি বিষয়ে আলোচনা করছিলো, আপনি জানেন ?

—না। কারণ তারা সব সময় আরবি ভাষায় কথাবার্তা বলতো।

—আচ্ছা, আব্দুল যেদিন রাতে মারা যায় সেদিন আপনার ঘরে কোনো ঘটনা ঘটেছিলো ?

সুজিত একটু ইতস্তত করছিলো। সে একবার ভাবলো, সেদিন রাতের ঘটনার কথা তার পক্ষে বলা উচিত হবে কিনা।

সুজিতকে চুপ করে থাকতে দেখে মিঃ ম্যাথুস বললেন। চুপ করে আছেন কেন ? আমি জানি, সেদিন রাতে আপনার ঘরে কেউ ঢুকেছিলো।

সুজিত ভয়ে ভয়ে বললো, হ্যাঁ। এক ছায়ামূর্তি। আপাদ-মস্তক সাদা কাপড়ে ঢাকা। ঠিক মিশরের মমির মতো পোশাক।

—লোকটির সঙ্গে আপনার ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছিলো ?

—হ্যাঁ।

—আপনি কি করে রক্ষা পেলেন ?

—মিঃ রিচার্ডসন আমায় বাঁচিয়েছিলেন। তিনি সে সময় এসে না পড়লে আমার সেদিনই মৃত্যু হতো।

—লোকটি যে মমি তা কি করে জানলেন ?

—রিচার্ডসন সাহেব আমায় বলেছিলেন। কিন্তু এখন দেখছি, রিচার্ডসনই মমি। আমার সমস্ত ঘটনাটা গুলিয়ে যাচ্ছে।

—অতো বড়ো ঘটনা ঘটলো, কাউকে জানান নি কেন ?

—রিচার্ডসন বারণ করে দিয়েছিলেন।

—কেন ?

—উনি বলেছিলেন, জানাজানি হলে ক্ষতি হবে। উনি এখানে ছদ্মবেশে আছেন। পরিচয় জানালে ওঁর আসল কাজের ক্ষতি হবে।

—ওদিন আবার কখন ঘুমোতে গেলেন ?

—রাত তিনটের সময়।

—যখন ঘুমোতে যান তখন রিচার্ডসন কি করছিলেন ?

—তিনিও তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

—ঐ দিন কি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ?

—না। অনেকক্ষণ ঘুম আসেনি। শুয়ে শুয়ে অনেক কিছু ভাবছিলাম।

—আচ্ছা, ঐ সময় কোনো শব্দ শুনেছিলেন কি ?

—শব্দ ! দাঁড়ান, মনে করে নিই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাশের ঘরে খুট করে আওয়াজ শুনেছিলাম।

—পাশের ঘর মানে মিঃ রিচার্ডসনের ঘর ?

—হ্যাঁ।

—আপনি কি মনে ভাবলেন ?

—ভাবলাম, মিঃ রিচার্ডসন হয়তো বাথরুমে যাচ্ছেন। ওঁর বাথরুম ঘরের লাগোয়া নয়। দরজা খুলে যেতে হয়।

—তারপর আর কিছু জানেন ?

—না। আমি তারপর ঘুমিয়ে পড়ি।

—ঘুম থেকে উঠেই তো আব্দুলের খুনের খবর পেয়েছিলেন, তাই না ?

—হ্যাঁ।

মিঃ ম্যাথুস তাঁর সহকারীকে কি একটা ইঙ্গিত করলেন। সহকারী ভেতর থেকে একটি পোশাক নিয়ে এলেন। একটি সাদা আলখাল্লা। সাদা বেল্ট। মিঃ ম্যাথুস সেটি তাঁর সহকারীকে পরিয়ে দিলেন।

সুজিত অস্ফুট চিৎকার করে উঠলো, মমি, এইতো মমির পোশাক। এই পোশাক পরেই মমি আমার ঘরে এসেছিলো। এ পোশাক আপনি কোথায় পেলেন, মিঃ ম্যাথুস ?

মিঃ ম্যাথুস জবাব দিলেন, আব্দুলের ঘরে সার্চ করে এই পোশাক পাওয়া গিয়েছে। এই পোশাক পরেই আব্দুল আপনার ঘরে গিয়েছিলো। আপনার বিছানায় যে চুল পাওয়া গিয়েছে, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে সেটি আব্দুলের।

—তাহলে, আব্দুল মমির চর ? মিঃ রিচার্ডসন আমাকে ঠিকই বলেছিলেন, আব্দুলকে তাঁর সন্দেহ হয়। কিন্তু আব্দুলকে খুন করলো কে ?

—খুন করেছে রিচার্ডসন অর্থাৎ মমি। কিন্তু আপনিও তার সঙ্গে ছিলেন মিঃ রয়। আব্দুল যে আপনার ঘরে ঢুকেছিলো, তার প্রমাণ তো রয়েছেই। আপনি ও আপনার বন্ধু রিচার্ডসন এরপর আব্দুলকে খুঁজে বার করেন। তারপর দু'জনে মিলে তাকে হত্যা করে আবার যে যার ঘরে ফিরে আসেন। বলুন, অস্বীকার করতে পারেন ?

সুজিত চিৎকার করে উঠলো, না-না। এ মিথ্যা, জঘন্য মিথ্যা। আমি কিছু জানি না। আব্দুলকে খুন করার বিষয়ে আমি কিছু জানি না।

মিঃ ম্যাথুস বললেন, আপনার সম্পর্কে রেফারেন্স আনবার জন্য আমরা ক্যালকাটা আর লণ্ডনে কেব্‌ল করেছি। আপনি আজকের রাতটার মতো বিশ্রাম করুন। তারপর যা হয় করা যাবে। কিন্তু সত্য গোপন করবেন না। মনে রাখবেন, অপরাধী অপরাধ গোপন করতে যতো চেষ্টাই করুক, ধরা তাকে পড়তেই হবে।

॥ বারো ॥

খুনের দায়ে



জেল হাজতে সারারাত সুজিতের ঘুম হয়নি। বার বার তার মায়ের কথা মনে পড়েছে। আচ্ছা, মা যদি এ অবস্থায় তাকে এখানে দেখেন তাহলে হয়তো অজ্ঞানই হয়ে যাবেন।

জীবনে এই তার প্রথম বিপদের মধ্যে পড়া।

যদি খুনের দায়ে সত্যি সত্যি তার ফাঁসী হয়ে যায়!

সুজিত ঠিক করলো, কাল ভোরে সে ভারতীয় দূতাবাসের শরণাপন্ন হবে। সে সাহায্য চাইবে। ৫নং শাহ আল মাহাদ আস সুইসারিতে ভারতীয় দূতাবাস। টেলিফোন নম্বরটাও তার ডাইরিতে লেখা আছে।

ডাইরিটা বার করে দেখলো, হ্যাঁ, লণ্ডন থেকেই সে লিখে এনেছিলো। ৮০৬০৫২ সি ওয়ান।

মিঃ ম্যাথুস কাল বিদায় নিয়েছিলেন রাত বারোটায়। তাঁকে সমস্ত ঘটনাই খুলে বলেছে সুজিত। ম্যাথুস অবশ্য বলেছে, যতোদূর করার তিনি করবেন। কিন্তু তবু তার মন থেকে একেবারে সন্দেহ যায়নি। কিন্তু কাল বিকেলের ফ্লাইটটা সে অ্যাভেল করতে পারবে না। অতএব—অতএব এ শহরে তাকে কিছুদিন আটক থাকতেই হবে।

এই সব ভাবতে ভাবতে কোথা থেকে ভোর হয়ে গেলো। তবু ভাগ্যি ভালো, তার সঙ্গে কায়রো পুলিশ এ পর্যন্ত ভালো

রাতে খাওয়া-দাওয়ারও কোনো অসুবিধা হয়নি।

সকালবেলা এলেন মিঃ ম্যাথুস।

মিঃ রয়, মমি কাল রাতে মারা গেছে। কোনো ষ্টেটমেণ্ট করে যাবার সময় পায়নি। ষ্টেটমেণ্ট করলে অবশ্য আপনার পক্ষে সুবিধাই হতো। তবে আপনাকে একটা খবর দিই। আজ সকালের কাগজে এই হীরক উদ্ধারের ঘটনাটা ছাপা হয়েছে। কাগজে ঘটনাটা পড়ে ইণ্ডিয়ান এমব্যাসীর ফার্ষ্ট সেক্রেটারি মিঃ মিত্র সকালে আমাকে টেলিফোন করেন। মিঃ মিত্র আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য ডিপ্লোম্যাটিক লেভেলে পারমিশন চেয়েছেন। সে পারমিশন হয়েও যাবে।

—কিন্তু কবে আমি মুক্তি পাবো, বলতে পারেন?

—মনে হয়, আজ কালের ভেতরেই। আপনাকে শুধু আজকে একবার আদালতে যেতে হবে। সমস্ত মামলাটা আমরা সাজাচ্ছি আপনার ষ্টেটমেণ্ট অনুসারে। একটু তদন্ত শুধু বাকি। তারপর আপনার নির্দোষিতা সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দিহান হবো।

মিঃ ম্যাথুস চলে গেলেন।

ব্রেকফাষ্ট খেয়ে পুলিশের গাড়ি করে সুজিত ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে গেলো। সেখানে গাড়ি থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই এক ঝাঁক ফোটোগ্রাফার তার ছবি তুলে নিলো। হাত দিয়ে মুখ ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করলো সুজিত। কিন্তু বোধহয় পারলো না।

ওঃ! এই ছবি কালকের সব কাগজে বার হবে।

সুজিত খুনী! সুজিত চোরাই চালানকারী! সুজিতের যেন কান্না পেতে লাগলো।

আদালত বসতে তখনও কিছু দেরি ছিলো।

মিঃ ম্যাথুস এসে বললেন, মিঃ মিত্র এসে গেছেন। হোম মিনিষ্ট্রি ওঁকে পারমিশন দিয়েছেন। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

একজন মধ্যবয়সী সৌম্যদর্শন ভারতীয় এগিয়ে এলেন।

—হ্যাঁ। সুজিত যেন তার পরম আত্মীয়কে পেলো।

—আমার নাম অলক মিত্র। আমি ভারতীয় দূতাবাসের ফার্ষ্ট সেক্রেটারি।

সুজিত বললো, আমায় বাঁচান স্যর। এরা আমাকে খুনী সাব্যস্ত করেছে। এরা আমাকে ফাঁসী দেবে। বিশ্বাস করুন, আমি নির্দোষ।

অলক মিত্র পরম স্নেহে সুজিতের পিঠে হাত রাখলেন। বললেন, তোমার কোনো ভয় নেই। সমস্ত ঘটনা আমাকে খুলে বলো তুমি।

ম্যাথুস বললেন, আপনারা কথা বলুন। আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।

অলক মিত্রকে সব কথা খুলে বললো সুজিত।

অলক মিত্র বললেন, তুমি কিছু ভেবো না। ভারতীয় দূতাবাস তোমার পিছনে আছে। তোমার মা-বাবাকে আমরাই চিঠি লিখে জানাবো, তোমার ফিরতে দু'একদিন হয়তো দেরি হতে পারে। আচ্ছা, কলকাতায় তোমাদের বাড়িটা কোথায় ?

সুজিত বললো, ১৯নং বালিগঞ্জ টেরাস।

আরে ওখানে তো আমার দাদার বাড়ি। আমার ভাইপোকে তুমি নিশ্চয়ই চেনো, ঝণ্টু ডাক নাম, ভালো নাম শ্যামল।

—ঝণ্টু আপনার ভাইপো ? আরে ও তো আমার খুব বন্ধু ছিলো। আই. এস. সি. পাশ করে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে ঢুকলাম যাদবপুরে ও ভর্তি হলো মেডিক্যাল কলেজে। ও তো এখন বড়ো ডাক্তার। বিলেতে থাকতে ও আমাকে প্রায়ই চিঠি লিখতো। ঝণ্টুর কাছে শুনেছিলাম বটে ওর এক কাকা ফরেন সার্ভিসে আছেন।

—আমিই ওর সেই কাকা।

—তাহলে আপনি আমারও কাকাবাবু। কাকাবাবু, বিদেশে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এই বিপদের সময় আপনাকে পেয়ে বুকে একটু বল এলো। আমি যেভাবে মুষড়ে পড়েছিলাম।

অলক মিত্র বললেন, অন্যায় আর ভাগ্য এ দু'জনের কাছে কখনও

হার স্বীকার করবে না। আমি তো তোমাকে বলেছি, আমি তোমার পাশে আছি। বোধহয় আদালতের সময় হয়ে গেলো।

ম্যাথুস এসে তাড়াতাড়ি ওদের ডাকলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট জানালেন, ভারতীয় দূতাবাস যদি দায়িত্ব নিতে রাজি থাকেন তাহলে সুজিতকে জামিনে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। শুনানী মুলতুবি রইলো। ভারতীয় দূতাবাস জামিনের দায়িত্ব নিতে রাজি হলেন। ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে একজন উকিল প্রার্থনা জানালেন, এই মামলার নিষ্পত্তি যেন তাড়াতাড়ি করা হয়। কারণ সুজিত রায়ের প্যাসেজ আজ বুক করা ছিলো। সে প্যাসেজ বার বার ক্যানসেল হলে তার আর্থিক ক্ষতি হবার সমূহ সম্ভাবনা।

ম্যাজিষ্ট্রেট সেই অনুসারেই নির্দেশ দিলেন তিনদিনের মধ্যে চার্জশীট দাখিল করতে হবে।

আদালত বন্ধ হবার পর অলক মিত্র বললেন, সুজিত, চলো তোমাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে আসি।

অলক মিত্র হোটেল পর্যন্ত গেলেন।

সুজিতকে দেখে হোটেলের ম্যানেজার এগিয়ে এলেন।

—আপনার সঙ্গে কথা আছে স্যর।

—বলুন।

—আপনাকে আর এই হোটেলে জায়গা দেওয়া সম্ভব হবে না।

—কেন ?

—আব্দুলের খুনের সঙ্গে আপনি জড়িত। আন্তর্জাতিক চোরাই চালানকারি দলের সঙ্গে আপনি জড়িত। এমনিতেই আমাদের হোটেলের যথেষ্ট বদনাম হয়ে গেছে। আপনার মালপত্র নিয়ে আপনি এই মুহূর্তে হোটেল ছেড়ে চলে গেলে ভালো হয়।

—কিন্তু আমার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগই অসত্য। তাছাড়া আমার মামলা বিচারাধীন। এ অবস্থায় আমাকে আপনি অভিযুক্ত করতে পারেন না।

—দেখুন, আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। আমাদের হোটেলে আর আপনাকে রাখা সম্ভব নয়।

অলক মিত্র এবার কথা বললেন, দেখুন আমি ভারতীয় দূতাবাসের ফার্ষ্ট সেক্রেটারি বলছি, মিঃ রয় নিরপরাধ। ওঁকে এভাবে হোটেল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া আপনাদের উচিত হবে না।

ম্যানেজার বললেন, দেখুন, ব্যক্তিগতভাবে ইণ্ডিয়ানদের আমরা খুব পছন্দ করি। ইণ্ডিয়া সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু এই বিশ্রী মামলাটি হবার পর আমাদের হোটেলের যথেষ্ট বদনাম হয়ে গেছে। জনসাধারণের মনে ধারণা হয়েছে যে আমাদের হোটেলে চোরাকারবার, খুনজখম হয়ে থাকে। আমরা ব্যবসা করতে বসেছি। সুতরাং ব্যবসায়িক স্বার্থটা আমাদের আগে দেখতে হবে।

অলক মিত্র বললেন, সুজিত, তাহলে আর কি করা যাবে। তুমি চলো আমার বাড়িতে। গরিব কাকার বাড়ি ক'টা দিন থাকবে।

সুজিত যেন বিশ্বাস করতে পারেনি। সে অবাক হয়ে বললো, আপনি আমাকে আশ্রয় দেবেন ?

—দেবো। তবে তোমার একটু কষ্ট হবে। হোটেলের কম্ফর্ট তো আর পাবে না।

খালেক আমার চাকর-কাম-ঠাকুর ছাড়া আর কেউ এখানে নেই। তবে খালেক রাঁধে ভালো।

—কেন ? কাকীমা নেই ?

—না। তোমার কাকীমা আর আমার মেয়ে খুকু ছুটিতে দিল্লি চলে গেছে। দিল্লি আমার শ্বশুর বাড়ি। এ সময়টা হলো আমাদের ছুটির সময়। আমিও যেতাম। নেহাৎ আমাদের রাষ্ট্রদূত এখানে নেই। উনিও দু'মাসের হোম লিভে গিয়েছেন বলে আমাকে তাঁর কাজকর্ম দেখতে হচ্ছে।

—ভাগ্যিস আপনি ছিলেন।

—তাই এখন ভাবছি। তোমার জন্যেই আমার ছুটিতে যাওয়া হয়নি।

গাড়ি এসে থামলো এক সুন্দর বাড়ির সামনে। বাইরে লতাপাতার গেট। ভেতরে ফুলের বাগান। জায়গাটিও বেশ মনোরম। মনে হয় না, শহরের এতো ভেতরে আছি।

অলক মিত্র বললেন, এই আমার বাড়ি। ওপাশে থাকেন সেকেণ্ড সেক্রেটারি মিঃ যোশী। এ পাশটায় আমি। এসো, ভেতরে এসো। খালেক, খালেক।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভেতর থেকে উর্দিপরা কৃষ্ণকায় এক ব্যক্তি ছুটে এলো।

আরবি ভাষায় অলক মিত্র তাকে কি বুঝিয়ে দিলেন।

—তুমি ওর সঙ্গে ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম করো। আমি একটু অফিসে যাচ্ছি। এই সময়টা ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ আসে। আমাকে একটু ব্যস্ত থাকতে হয়। লাঞ্চটা তুমি একাই সেরে নিও। রাতে ডিনার একসঙ্গে খাওয়া যাবে। কিছু মনে করো না, কেমন ?

অলক মিত্র চলে গেলেন। ভারি বুটের আওয়াজ মিলিয়ে গেলো। তারপর শোনা গেলো গাড়ির ষ্টার্ট নেওয়ার শব্দ।

লাঞ্চ সেরে সুজিত সবে বিশ্রাম করছে এমন সময় খালেক এসে বললো, সাহেব আপনাকে টেলিফোনে ডাকছেন।

সুজিত গেলো টেলিফোন ধরতে।

—হ্যালো।

—হ্যালো, কে সুজিত ? শোনো, ম্যাথুস আমাকে ফোন করেছিলো। আজ রাতে বোধহয় কেসটার কিনারা হয়ে যাবে। আজ ওদের গ্যাং-এর আরও কিছু লোক ধরা পড়েছে। আজ সন্ধ্যায় ম্যাথুস তার বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছে তোমাকে আমাকে। সেখানে ইউ-এ.আর. গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র দফতরের কর্তারা থাকবেন। শোনো, আমি অফিস থেকে তোমায় গাড়ি পাঠিয়ে দেবো। গাড়ি তোমায় নিয়ে চলে আসবে এমব্যাসিতে। তারপর দু'জনে এক সঙ্গে যাবো। কেমন ?

—আচ্ছা।

সুজিত খালেককে ডেকে বললো, এখন আমি একটু ঘুমোচ্ছি। তুমি ঠিক চারটেয় আমাকে ডেকে দেবে।

—অল রাইট স্যর।

সুজিত বিছানায় শুয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লো। তার চোখে মেঘু ঢুলে আসছে।



॥ তেরো ॥

রহস্যের কিনারা

মিঃ ম্যাথুসের ড্রইংরুম।

আজকের সন্ধ্যায় নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আছেন কায়রো পুলিশের বড়ো কর্তা মিঃ ফারুক, স্বরাষ্ট্র দফতরের ডিরেক্টর মিঃ কাশেম, এক ডজন পুলিশ কর্মচারী ও কায়রোর দু'টি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। এই মামলায় যাঁরা অংশ নিয়েছেন সেই সব উকিলেরা আর সুজিত ও অলক মিত্র।

মিঃ ম্যাথুস বলতে আরম্ভ করলেন, মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণ, আজ আপনাদের সবাইকে কি জন্য ডেকেছি তা জানতে নিশ্চয়ই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। ডেকেছি আলোড়নকারী হীরক চুরি মামলার রহস্য আপনাদের সামনে উদ্‌ঘাটন করবো বলে।

এ মামলার অপরাধীদের আমরা আগেই ধরে ফেলেছিলাম। এবং সেই বিখ্যাত হীরক খণ্ডটিও আমরা উদ্ধার করেছিলাম। কিন্তু কতগুলি ঘটনার কার্য কারণের সম্পর্ক কোনোমতেই মেলাতে পারছিলাম না। যার জন্য একজন নিরপরাধ বিদেশীকে আমরা এই ব্যাপারে দোষী সাব্যস্ত করি। কিন্তু আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে মিঃ সুজিত রয় যাঁকে আমাদের আব্দুলের হত্যার ব্যাপারে জড়িত বলে সন্দেহ হয়েছিলো, তিনি নিরপরাধ।

সুজিতের ইচ্ছা করলো, সে আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে। কিন্তু উচ্ছ্বাস দমন করে সে বসে রইলো।

মিঃ ম্যাথুস বলতে আরম্ভ করলেন, কায়রোতে এক বিখ্যাত

চোরাই চালানকারী আছে। নাম তার আরিফ। আরিফের সঙ্গে মমির অনেক দিনের লেনদেন। আরিফ মমির কাছ থেকে চোরাই হীরে কিনে অন্যত্র চালান করে দিতো।

কিন্তু কিছুকাল আগে মমি আরিফকে একটা হীরের ব্যাপারে ঠকায়। অগ্রিম কিছু টাকা নিয়ে আর মাল দেয় না।

এতে আরিফ মমির উপর চটে যায়। সে ঠিক করে, এর বদলা সে নেবে।

কোহিনুর হীরেটি চুরি যাবার খবর কাগজে বেরিয়েছিলো। আরিফ জানতো, এটা মমি ছাড়া আর কারুর কাজ হতে পারে না। সে মমিকে জানায়, চল্লিশ হাজার ডলার সে হীরেটার জন্য দিতে রাজি আছে। মমি যেন ওটি নিয়ে কায়রো চলে আসে।

মমি জানতো কায়রোতে এই হীরে নিয়ে আসা কী বিপজ্জনক। পুলিশ, কাষ্টমস আর আরিফের চোখ এড়িয়ে হীরেটা রক্ষা করাও অসম্ভব ব্যাপার।

কিন্তু অসাধারণ ধুরন্ধর ছিলো এই মমি। তার কাছে কোনো কাজই যেন অসাধ্য ছিলো না। আমেরিকা গিয়ে সে এক জাল টুরিষ্ট পাশপোর্ট জোগাড় করে। এবার হীরেটা নিতে হবে। সে একটা বিশেষ ধরণের লাইটার তৈরি করে। বাইরে থেকে দেখে কিছুই কিন্তু বোঝার উপায় ছিলো না যে ওরই মধ্যে আছে মহামূল্য মণি।

মমির পক্ষে রিচার্ডসন বনে যাওয়া খুব কঠিন ছিলো না। কারণ মমির আসল চেহারা কেউ কোনোদিন দেখেনি। ওকে যে সব পুলিশ অফিসার আগে দেখেছেন কেউ তার আসল চেহারায় দেখেন নি। বৃটেনের ঐ হীরক ব্যবসায়ীর কাছে সে যখন কাজ করতো তখন তার ছিলো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। দাড়ি কামিয়ে হেয়ার ষ্টাইল পালটে ভোল বদলানো কিছু অসম্ভব নয়।

যদিও সতর্কতার ত্রুটি রাখেনি। তবু কায়রো বিমান বন্দরে নামার আগে মমি এক চাল খেললো। পরিচয় হলো এক ভারতীয় তরুণের সঙ্গে। সে যাবে কায়রোতে। কোথায় উঠবে তাও তার জানা হয়ে গেলো।

মমি করলো কি, লাইটারটি পাচার করে দিলো তার পকেটে। এরপর সে বুক ফুলিয়ে কাষ্টমস চেকিং পার হয়ে গেলো। তারপর হাজির হলো মেট্রোপোলে, ভাণ করলো সে কোথাও জায়গা পায়নি। কারণ ঐ তারিখে পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম কায়রোর সব হোটেলেই ঘর খালি ছিলো।

তারপর সে বললো, লাইটারটি সে খুঁজে পাচ্ছিলো না। এই লাইটারটি সুজিতের কাছে রেখে দেবার জন্য সে এক রোমাঞ্চকর গল্প ফাঁদলো। জানতো যে এই ধরণের গল্প শুনলে যে কোনো তরুণই সাহসিকতা দেখাবার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠবে।

এবং সে ওয়াচ রাখার জন্য সুজিতের পাশের ঘরটা নিয়ে নিলো। এখন কেন সে নিজেকে ইণ্টারপোলের অফিসার বলে পরিচয় দিলো? এই পরিচয়ে সে আগেও দু'-এক জায়গায় ব্ল্যাকমেল করেছে। তার কাছে বহু ভূয়া লেটার হেড ও ভিজিটিং কার্ড যে ছাপানো থাকতো তা তার সুটকেশ সার্চ করে জানা গিয়েছে।

আর একটা কারণ ছিলো। কায়রোতে তার কাজকর্ম কিছুটা গোপনীয় ও রহস্যময় হবেই। এই ব্যাপারে সুজিতের কাছে একটা কৈফিয়ৎ খাড়া করার জন্যই সে নিজেকে ইণ্টারপোলের অফিসার বলে। কারণ পুলিশের পক্ষে এই ধরণের কাজকর্ম স্বাভাবিক।

কায়রোতে মমির একজন দালাল ছিলো তার নাম খলিল। খলিলের মাধ্যমে আরিফের সঙ্গে কথাবার্তা চলছিলো।

মমি কিন্তু আরিফকে বিশ্বাস করেনি। তার মনে আশঙ্কা হতো যে আরিফ যদি তাকে মেরে হীরেটা কেড়ে নেয়! হীরেটা সুজিতের কাছে রেখে সে নিশ্চিন্ত ছিলো। এদিকে আরিফের মতলব ছিলো হীরেটা চুরি করা। সে হোটেলের বেয়ারা আব্দুলকে হাত করে। আব্দুল ইতিপূর্বে আরিফের অনেক কাজ করতো। আব্দুলের উপর ভার পড়ে হীরেটা চুরি করার।

আব্দুলকে মমির সন্দেহ হয়। আব্দুল যেদিন খুন হয় সেদিন সকালে সে সুজিতের দরজার ছিটকিনি খুলে রাখে। বাথরুমের দু'টি দরজা। একটি ঘরের ভিতর দিয়ে। আর একটি ঘরের বাইরে দিয়ে।

স্বভাবতই এই দরজায় ছিটকিনি ঠিকমতো লাগানো আছে কিনা তা ওরা কেউই দেখেনি।

আব্দুলের মনে হয়, সুজিতের ঘরে হয়তো হীরেটা পাচার করে দিতে পারে মমি। কারণ সুজিতের সঙ্গে মমির খুব ভাব ও দেখেছিলো, আরিফের লোকজনও সুজিতকে পথে অনুসরণ করতো।

আব্দুল সুজিতের ঘরে ঢুকেছিলো। ঘর থেকে সে যখন বেরোলো তখন সে রিচার্ডসনের সামনাসামনি পড়ে যায়।

মমি সে সময় আব্দুলকে চিনতে পারে।

সুজিত জেগে আছে। একটা কেলেঙ্কারি হবে দেখে সে কিছু বলে না। তারপর সুজিত ঘুমোতে গেলে আব্দুলকে খুঁজতে নিচে চলে যায়। তৈরি হয়েই ও বেরিয়েছিলো। এই সময় সুজিত দরজা খোলার শব্দ শুনতে পায়। মমি তখন বাথরুমে নয় আব্দুলকে হত্যা করতে যাচ্ছিলো। হাতে ছিলো তার গ্লাভ্স।

আব্দুল তখনও লাউঞ্জে লুকিয়েছিলো।

মমির সন্দেহ হয়েছিলো আব্দুল লাইটারটি চুরি করে নিয়ে এসেছে। একথা তো সে সুজিতকে আর জিগ্যেস করতে পারে না। তাই সে নিজে এসেছিলো আব্দুলের খোঁজে।

আব্দুলকে মমি পেলো। টিপে ধরলো ওর গলা। বেচারা চেঁচাতেও পারলো না।

পকেট অনুসন্ধান করে কিছু পাওয়া গেলো না।

নিশ্চিন্ত হয়ে সে ঘরে ফিরে এলো।

পরদিন সকালে পূর্বনির্দেশমতো মমি হাজির হলো আরিফের গুপ্ত ডেরায়।

আরিফ যেই শুনলো আব্দুল নিহত হয়েছে তখনই সে ক্ষিপ্ত হয়ে মমি আর খলিলকে আটক করলো। তার ধারণা ছিলো মমির কাছেই কোথাও সেই হীরেটা আছে।

কিন্তু মমি অতো বোকা নয়। সে ঠিক করেছিলো যদি আরিফের সঙ্গে তার দরে পোষায় তাহলে সে সুজিতের কাছ থেকে হীরেটা

নিয়ে আরিফকে দেবে। উপযুক্ত মূল্য না পেলে সে কিছুতেই ওটা হাত-ছাড়া করবে না।

সে ঠিক করেছিলো, ছদ্মবেশ ধরে সে নিজেই লাইটারটা আনতে যাবে অথবা খলিলকে পাঠাবে।

মমির সন্ধানে আমি গত পাঁচ বছর পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি। মাত্র দিন কয়েক আগে আমি জানতে পারি, মমি কায়রোতে। আমি সোজা কায়রো চলে আসি।

কিন্তু এতোবড়ো একটা শহরে মমিকে খুঁজে পাওয়া সহজ কথা নয়। ঠিক সেই সময়ই জানতে পারলাম, মেট্রোপোল হোটেলে একজন খুন হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম সেখানে।

কায়রো পুলিশ সন্দেহ করলো সুজিতকে। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম, রিচার্ডসন বলে একজন বিদেশী সকাল থেকে নিখোঁজ। দেহের যা বর্ণনা পেলাম তাতে সন্দেহ রইলো না, সেই মমি।

আমি নির্দেশ দিলাম সুজিতের ওপর নজর রাখতে হবে। ওকে গ্রেফতার না করে ওকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দাও আর প্রতিটি মুভমেণ্টের ওপর চোখ রাখো। তাহলেই অনেক রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে।

পুলিশ ওকে ফলো করে এলো পিরামিডে। এদিকে দুপুরবেলা একজন এসে ওকে চুপি চুপি চিঠি দিয়ে গেলো, তাও দেখলাম।

কিন্তু মমি নিজেই তার মৃত্যুবাণ লিখে রেখেছিলো—ওই চিঠি।

মমিকে সার্চ করে আরিফ এই চিঠিটা পায়। চিঠিটা পড়ে প্রথমে সে বুঝতে পারেনি। কিন্তু পরে তার মনে ঘোরতর সন্দেহ হয় যে ঐ লাইটারটির মধ্যেই হীরেটা আছে। কারণ না হলে সে খামোখা সামান্য একটা লাইটারের জন্য এভাবে চিঠি লিখতে যাবে কেন!

সে তার এক অনুচরকে ওই চিঠিটা দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। আরিফের ওই অনুচরই হোসেন। তাকে বলে দেওয়া হয়, সুজিতকে সে যেন গাইডের ছদ্মবেশে পিরামিডের ভেতর নিয়ে যায়। তারপর লাইটারটি হাত করে।

হোসেনকে বলে দেওয়া হয়েছিলো, সে যেন সুজিতকে বলে, সে

ইন্টারপোলের লোক। কারণ রিচার্ডসন যে কাগজে সুজিতকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখেছিলেন, সেটি ছিলো ইন্টারপোলের লেটার হেড।

এদিকে মমি ও খলিল নিজেদের মুক্ত করে নিয়ে পিরামিডে ছুটে এসেছিলো। মমি বুঝেছিলো ঐ চিঠিটার সাহায্যে আরিফ লাইটারটি হাতাবে। তার অনুমানে ভুল হয়নি। কিন্তু মমির পৌঁছোতে দেরি হয়ে গিয়েছিলো। তার মধ্যে হোসেন কাজ সমাধা করে ফেলেছে।

আব্দুলের মৃত্যুর পর থেকে আমরা সুজিত ও রিচার্ডসনের ওপর কড়া নজর রেখেছিলাম। সুজিত যে পিরামিড যাবে সে খবর না পেলেও আমরা তার মুভমেন্টের খবর রাখতাম। সুজিত যে বাসে পিরামিড গেলো, তার পিছনে পিছনে সাদা পোশাক-পরা এক গাড়ি পুলিশ ফলো করেছে। তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম।

আমরা দেখলাম, একটা উটওয়ালার সঙ্গে সুজিত গিয়ে পিরামিডে ঢুকলো। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ওরা কেউ বেরোচ্ছে না দেখে আমি একদল সশস্ত্র পুলিশবাহিনী আনাবার জন্য ফোন করে দিলাম। তারপর আমরা পিরামিডের ভেতরে ঢুকলাম।

হোসেন যখন পালাচ্ছিলো তখন আমাদের এক অফিসার ওকে চ্যালেঞ্জ করে। হোসেন তখন তাকে গুলি ছোঁড়ে। কিন্তু আমাদের ফোর্স বেশি ছিলো। আমরা তাকে ধরে ফেলি। তার কাছে লাইটার আর রিং পাওয়া যায়।

হোসেন কবুল করে, সে সুজিতের কাছ থেকে এগুলি নিয়ে এসেছে।

এদিকে আমাদের ফোর্স সার্চ করতে করতে রিচার্ডসন আর সুজিতকে ধরে ফেলে। তখনও পর্যন্ত সুজিতের ধারণা ছিলো রিচার্ডসন সত্যি সত্যি ইন্টারপোলের অফিসার।

সুজিত বললো, ঘুণাক্ষরেও আমি বুঝতে পারিনি।

মিঃ ম্যাথুস বললেন, মিঃ রয়, আপনাকে বলি, ভবিষ্যতে অজ্ঞাত-পরিচয় লোককে কখনো এতোখানি বিশ্বাস করবেন না।

আমি ভাবছি, আরিফের কথা। চোরের ওপর বাটপাড়িঃ করতে চেয়েছিলো সে।

আরিফ বুঝতে পেরেছিলো, লাইটারটা কতো দামী। সে আসরাফকে উটওয়ালা সাজিয়ে সুজিতকে নিয়ে গেলো পিরামিডের মধ্যে। কিন্তু অভিশপ্ত হীরেটা নিয়ে সে আর বেরোতে পারলো না। আমাদের গুলিতে বেচারা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো। এদিকে মমিও কোনো রকমে নিজেদের মুক্ত করে নিয়ে ছুটে এসেছিলো পিরামিডে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকার শোক বোধহয় সামলাতে পারলো না বেচারা।

আজ বিকেলে আরিফকে তার ডেরা থেকে আমরা গ্রেফতার করেছি। সে সব কথা কবুল করেছে। মিঃ রয় সম্পর্কে তখনই আমরা নিঃসন্দিহান হতে পারলাম।

ভদ্রমহোদয়গণ, আগামীকাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে আমরা সুজিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেবো। তবে তিনি হবেন এই মামলার প্রধান সাক্ষী। এজন্য ষ্টেট গেষ্ট হিসাবে আমরা তাঁকে এক সপ্তাহ কায়রো রেখে দিতে চাই। কথা দিচ্ছি, এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁকে আমরা ছেড়ে দেবো। মিঃ মিত্র, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

মিঃ মিত্র বললেন, এ অতি উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু আমি বলি কি, সুজিতের ষ্টেট গেষ্ট হয়ে কাজ নেই। ও আমার কাছে আছে। আমার কাছেই সাতদিন থাক।

উপস্থিত সকলে সুজিতের সঙ্গে এসে করমর্দন করে বললেন, আমরা দুঃখিত। আশা করি, কিছু মনে করবেন না।

বাইরে আসতেই সুজিত অলক মিত্রকে বললো, কাকাবাবু, আপনাকে প্রণাম করবো, একটু দাঁড়ান।'

অলক মিত্র তাড়াতাড়ি সুজিতকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, পাগল ছেলে। এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি চলো। খালেকের তৈরি খাবার সব বোধ হয় জুড়িয়ে গেলো।

॥ চোদ্দ ॥

উপসংহার



কায়রো আদালতে মামলা উঠলো।

সে এক বিরাট চাঞ্চল্যকর মামলা। পৃথিবীর সমস্ত খবরের কাগজে সে মামলার খবর বেরিয়েছিলো। ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে বিচারপতির কাছে আবেদন করা হলো, সুজিত রয় এ ব্যাপারে নির্দোষ।

পুলিশও তাদের চার্জশীটে সুজিতকে অব্যাহতি দিলো। তবে সুজিতকে এ মামলায় প্রধান সাক্ষী হিসাবে খাড়া করা হলো।

জেরার উত্তরে সুজিত সমস্ত ঘটনা বলে গেলো।

বিচারক খুব তাড়াতাড়ি বিচারের রায় দেবেন বলে জানালেন।

galpochhabi.blogspot.com

মিঃ মিত্রর বাড়িতেই সুজিত রয়েছে।

এদিকে সুজিতের মা-বাবা টেলিগ্রাম করেছেন।

সুজিত সম্পর্কে সমস্ত খবর রয়টার থেকে সব কাগজে পাঠানো হয়েছে। কলকাতার ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় বড়ো বড়ো করে খবর বার হয়েছে, চাঞ্চল্যকর হীরে চুরির মামলায় ভারতীয় তরুণ। দুর্ধর্ষ চোরাই চালানকারি মমির আত্মহত্যা।

এই খবর পড়ে ওঁরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। সুজিতকে মিঃ মিত্র বললেন, আমি ওঁদের চিঠি লিখে দিয়েছি। তুমিও চিঠি লিখে দাও। কোনো ভয় নেই। আর পনেরো দিনের মধ্যেই তুমি বাড়ি গিয়ে পৌঁছোবে।

সুজিত বললো, কাকাবাবু, আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেবো ভেবে পাচ্ছি না।

আমার কর্তব্য। আর বিদেশে ভারতীয় দূতাবাস কর্মীদের কাজই, ভারতীয়দের স্বার্থ দেখা। তবে আরব সাধারণতন্ত্রের লোকেরা ভারতবাসীদের খুব সম্ভ্রমের চোখেই দেখে। আমি মনে করি না, তোমার উপর কোনো অবিচার হবে। আর ভালোমন্দ লোক তো সব জায়গাতেই আছে।

সুজিত বললো, কাকাবাবু, এই বিপদের মুখে পড়ে আমার কিন্তু যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হলো। এখন মনে হচ্ছে, আমি কোনো দুঃসাহসিক কাজের ভার নিতে পারি।

মিঃ মিত্র বললেন, তোমাকে আমি আশীর্বাদ করছি সুজিত। তুমি আমাদের দেশের যোগ্য সন্তান হও। আমাদের দেশে এখন সাহসী তরুণের দরকার। আমার ইচ্ছা, তুমি দেশে ফিরে গিয়ে এমন কিছু করো, যাতে আমাদের তরুণদের সাহসী বলে খুব সুনাম হয়।

সুজিত বললো, আপনার উপদেশ আমি মনে রাখবো।

খুব তাড়াতাড়ি বিচারের রায় বেরোলো! আসামীদের সকলের দশ-বারো বছর করে জেল হলো।

মিঃ ম্যাথুস একদিন সুজিতের সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

সুজিত তাঁকে খাতির করে বসালো।

মিঃ ম্যাথুস বললেন, আমার কাজ শেষ। আমি প্যারিসে আমাদের ইন্টারপোলের হেড কোয়ার্টারে ফিরে যাচ্ছি। আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। এই কোহিনূর হীরেটি যে হীরক ব্যবসায়ীর তিনি আমাকে একখানি চিঠি দিয়েছেন। খবরের কাগজে তিনি হীরেটি উদ্ধারের খবর পেয়ে আনন্দে কেঁদে ফেলেন। এই দেখুন, তাঁর চিঠি। চিঠিখানি আজ সকালের ডাকে এসেছে।

সুজিত চিঠিখানি পড়লো। তাতে লেখা :

প্রিয় মিঃ ম্যাথুস,

আমার যথাসর্বস্ব ঐ কোহিনূর হীরার উদ্ধারের খবর পেয়ে আমি আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছি। বিশ্বাস করুন, কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে হীরাটি উদ্ধারের খবর যখন পড়লাম, তখন আনন্দে আমি

অশ্রু বিসর্জন না করে পারিনি। আপনি কয়েক বছরের চেষ্টায় নিজের জীবন বিপন্ন করে ওই হীরা উদ্ধার করেছেন এজন্য আপনাকে আমি এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেবো, ঠিক করেছি। খবরের কাগজে আরও পড়লাম তরুণ ভারতীয় ছাত্র সুজিত রায়ের কথা। জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক সুজিত আমার হীরাকে রক্ষা করেছে। সে পরম যত্নভরে ওটিকে রক্ষা করেছে। ওকে আমি পাঁচশো পাউণ্ড পুরস্কার দিতে চাই। আমি চেকটি তাকে পাঠিয়ে দেবো। আপনার ও মিঃ সুজিত রায়ের সম্মতি জানিয়ে আমাকে বাধিত করবেন।

সুজিত বললো, দেখুন, এ টাকা আমি নিতে পারবো কিনা কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করে আপনাকে জানাবো।

—কে, মিঃ মিত্র ? আমাদের ফার্স্ট সেক্রেটারি? ঠিক আছে। আপনি আমায় আজ সন্ধ্যাতেই জানিয়ে দেবেন। কাল সকালে আমার প্লেন।

—এরপর আপনার কি কাজ ?

—আর একটি আন্তর্জাতিক ডাকাতির মামলা আমার হাতে আছে। একটু বিশ্রাম নিয়ে সেই-দি আরবিয়ায় ডাকাত ধরতে বেরোবো। তারপর আপনি কবে ফিরছেন ?

—আমি পরশু সকালে।

মিঃ মিত্র সব শুনে বললেন, পাঁচশো পাউণ্ড মানে প্রায় এগারো হাজার টাকা। এ টাকার সঙ্গে আরও কিছু দিয়ে একটা গাড়ি কিনে ফেলো।

—তাহলে আপনি অনুমতি দিচ্ছেন, টাকাটা নিতে পারি।

—নিশ্চয়ই। ভদ্রলোক খুশি হয়ে দিচ্ছেন। নেবে না কেন ?

—কাকাবাবু, আমি ঠিক করেছি চাকরি যাই করি না কেন, দেশে ফিরে শৌখীন গোয়েন্দার কাজ করবো।

—বেশ তো। এ কাজে আমার পুরো সমর্থন রইলো। শৌখীন গোয়েন্দার আমাদের দেশে খুব অভাব। জয়ন্ত-মাণিক কিম্বা কিরীটি-সুব্রতর সঙ্গে তাহলে নতুন একটা নাম যোগ হবে, রহস্যভেদী সুজিত রয়।

মিঃ মিত্র হেসে উঠলেন। সুজিতও তার সঙ্গে যোগ দিলো।

●